# মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৬
# যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

## মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০৬

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত
৬ই মার্চ, ২০০৭

**ভূমিকা**

বিশ্বজুড়ে পুরুষ-মহিলা উভয়েই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য লড়ে যাচ্ছে। তাদের এই দাবী আদায়ের চেষ্টাকে প্রেসিডেন্ট বুশ অভিহিত করেছেন "মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপোষহীন দাবী"।

ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ঝুঁকি সত্ত্বেও সাহসী নাগরিকেরা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে। তাদের লক্ষ্য থাকে ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী, জাতি, কর্মী বাহিনী এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, এবং মানব পাচার বন্ধ করা। তারা চেষ্টা করে একটি উদ্যমী সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায়, মুক্ত ও স্বাধীন নির্বাচনে এবং জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।এই দুর্বার দেশ প্রেমিকরা তাদের অনেক সীমাবদ্ধতাকে জয় করে তার সংজ্ঞা বদলে ফেলেছে। ব্যক্তিগত ঝুঁকি বড় ধরনের বাধা সত্ত্বেও সাহসী ব্যক্তি ও বেসরকারী সংগঠনগুলো মানবাধিকার লংঘন তুলে ধরছে। তারা বিশেষ শ্রেণীর অধিকার, সংখ্যালঘু, শ্রমিক, নারী, অবৈধ মানব পাচার রোধে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সক্রিয় সুশীল সমাজ, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটাধিকার, জবাবদিহিতামূলক আইনের শাসন ভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।

এ মহৎ কাজটি চলছে। কিন্তু শেষ হয়নি বরং দৃঢ় প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে যারা ভীত তারাই গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলছে, সংস্কারের কাজ করছে। বিগত বছরগুলোতে আমরা মানবাধিকার কর্মী এবং সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে হয়রানি বা উৎপীড়ন এবং ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা এবং তাদের কর্মকান্ডের উপর বিধি নিষেধ এমনকি বন্ধ করে দিতে দেখেছি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে অন্যায্য আইন ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া আইন বহির্ভূত উপায়ে ভিন্ন মতাদর্শীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বেসরকারী এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো যখন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তখন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। সারা বিশ্বের গণতন্ত্রকামীদের এই প্রতিরোধকারীদের প্রতিহত করতে হবে।

এখনকার কূটনীতির এটি একটি অন্যতম লক্ষ্য। আশা করি, পররাষ্ট্র দফতরের এই উদ্যোগ "মানবাধিকার চর্চার উপর দেশওয়ারি প্রতিবেদন -২০০৬" সেই যাত্রাকে আরো এগিয়ে নেবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমি এই রিপোর্টটি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে জমা দিচ্ছি।

কন্ডোলিৎসা রাইস
পররাষ্ট্র সচিব

**সারসংক্ষেপ ও প্রাপ্তিস্বীকার**

মানবাধিকার চর্চার ওপর দেশওয়ারি প্রতিবেদন -২০০৬

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত

৬ মার্চ, ২০০৭

**প্রতিবেদনটি কেন তৈরি হল**

এই প্রতিবেদনটি পররাষ্ট্র দফতর ১৯৬১ এর বৈদেশিক সহায়তা আইন ১১৬(ডি) ও ৫০২ বি(বি) অনুচ্ছেদ অনুসারে কংগ্রেসে উপস্থাপন করে। অধ্যাদেশে উল্লেখ আছে, পররাষ্ট্র সচিব প্রতিনিধি সভায় স্পীকার বরাবর ও সিনেটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিতে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবেন। অধ্যাদেশের উপধারা (এ) অনুসারে যেসব দেশ এই অধ্যাদেশের অংশ হিসেবে অনুদান পেয়ে থাকে এবং উপধারা (বি) অনুসারে যেসব দেশ এই অধ্যাদেশের অংশ হিসেবে অনুদান পেয়ে থাকে এবং উপধারা (বি) অনুসারে যেসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং যেসব রাষ্ট্র এই অধ্যাদেশের আওতায় পড়ে তাদের ওপর এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। "আমরা এই প্রতিবেদনে আরো অনেক দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছি যা এই অধ্যাদেশের আওতায় পড়ে না বা কংগ্রেসের থেকেও কোন তাগিদ ছিল না।

১৯৭০ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ে কথা বলার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালে কংগ্রেস পররাষ্ট্র দফতর-এ মানবাধিকার সমন্বয়ক পদ সৃষ্টির বিধান করে, পরবর্তীতে এই পদকে সহকারি সচিব মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে কংগ্রেস নারী অধিকার বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা পদ সৃষ্টি করে। কংগ্রেস লিখিত একটি বিধান তৈরি করে, যার ভিত্তিতে কোন দেশের মানবাধিকার ও কাজের পরিবেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ভর করবে এবং তা নির্দিষ্ট হবে বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুসারে। ১৯৭৭ সালের প্রথম প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৮২টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পায়, এই বছর ১৯৬টি প্রতিবেদন জমা পড়ে।

**প্রতিবেদনটি কিভাবে তৈরি হল**

১৯৩৩ সালে পররাষ্ট্র সচিব আমাদের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে মানবাধিকারের ওপর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। প্রত্যেক দূতাবাসের সবগুলো বিভাগকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য ও প্রতিবেদন তৈরি এবং মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযান পরিচালনার জন্য বলা হয়। ১৯৯৪ সালে ব্যুরো অব হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্সকে পুনর্গঠন করা হয় এবং নাম দেয়া হয় গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো যাতে আরো ব্যাপক ও সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকার, শ্রমিকের অধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ে কাজ করা সম্ভব হয়। ২০০৬ সালের দেশওয়ারি প্রতিবেদন, পররাষ্ট্র দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের শত শত কর্মীর শ্রমের ফসল।

আমাদের দূতাবাসগুলো পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে যেমন রাজনৈতিক অবস্থা, সরকারি কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, সশস্ত্র বাহিনীর সূত্র থেকে, সাংবাদিক, মানবাধিকার পর্যবেক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ও শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে। এই তথ্য সংগ্রহ অনেক

সময় বিপদজনক হতে পারে, কারণ, যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের লোকজনকে ব্যাপক ভিত্তিতে কাজ করতে হয়, যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, আবার রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনের কর্মী যাদের ওপর সরকারের রোষানল পড়েছে সেইসব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া। দূতাবাসগুলো এই খসড়া প্রতিবেদন আরো সতর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াশিংটনে পাঠায়, যেখানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর এই দায়িত্ব পালন করে। এখানে নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্যের সমন্বয় সাধন, বিশ্লেষণ ও পরিমার্জন করা হয়। এখানে প্রাপ্ত তথ্যের উৎস মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ও গণমাধ্যম। কর্মকর্তারা শ্রমিক অধিকার, শরণার্থী, সেনা ও পুলিশ, নারী এবং আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ, এবং নিরপেক্ষ হতে হবে।

এই প্রতিবেদন নীতি নির্ধারণ, কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তাদানে এটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার সাপেক্ষে ব্যক্তিগত, নাগরিক, রাজনৈতিক, ও শ্রমিকের অধিকারের যে মানদণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সে অনুযায়ী মানবাধিকারের ওপর দেশওয়ারি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। নির্যাতন অথবা নানা রকম হিংসাত্মক, আমানবিক বা মানবতার জন্য অপমানজনক আচরণ ও শাস্তি, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই বা গোপনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়া, হিংসাত্মক উপায়ে অধিকার লঙ্ঘন থেকে মুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা এই অধিকারের মধ্যে পড়ে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারে লক্ষ্য হল সরকারের কর্মকান্ড ও আইন-কানুনের ভেতর এর প্রতিফলন ঘটানো। সব ব্যক্তিরই শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার রয়েছে। মৌলিক স্বাধীনতার ভেতর, মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠিত হবার অধিকার, সমাবেশ ও ধর্ম পালনের অধিকার এবং বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা ও লিঙ্গভেদে অধিকারের যেন তারতম্য না ঘটে সেই ব্যবস্থা করা। মুক্ত সমাজ ও অর্থনীতির জন্য মুক্ত বাণিজ্য সংস্থায় যুক্ত হবার অধিকার থাকতে হবে। প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, যেমন, সংগঠিত হবার অধিকার, সম্মিলিতভাবে দাবি-দাওয়া পেশ ও আদায়ের অধিকার, বাধ্যতামূলক বা জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ করা, শিশুশ্রমকে একটি মানদন্ডের আওতায় নিয়ে এসে সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করে দেয়া এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ব্যুরো অব ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লেবার থেকে যারা দেশওয়ারি প্রতিবেদন দলে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন, সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি স্টিফেন আইসেনব্রাউন, ব্রুস কনাক, নাদিয়া টঙ্গর ও ফ্রান্সিস্কো পলমেইরি অফিস পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন, জোনাথান বেমিস, ড্যানিয়েল ডোলান, স্টিফেন আইসেনব্রাউন, জেরোম এল হগানসন, সান্ড্রা মরফি, এলিজাবেথ রামবর্গার ও জুলি টার্নার সিনিয়র সম্পাদক, কুলসুম আলি, জোসেফ এস বার্ঘুট, কেট বার্গলান্ড সারাহ বাকলি, লরা ক্যারি, এলিস কালসন, রায়ান জে ক্যাষ্টিল, শেরিল ক্লেটন, শ্যারন সি কুক, সুসান কর্ক, ষ্টুয়ার্ট ক্রাম্পটন, টামরা

ক্রাউজ, ফ্রাঙ্ক বি ক্রাম্প, মলি ড্যাভিস, ডগলাস বি ডারবর্ন, কর্টনি ডেল, লরেন ডিসিলভিও, জোন গার্নার, সাবা ঘোরি, ক্যারেন গিলব্রাইড, ইলিয়ট গিলারম্যান, লিসা হেলার, ভিক্টও হাসের, স্ট্যান ইফশিন, ড্যাভিড টি জোনস, সাইমন জোসেফ, সালমান খান, অ্যান নাইট, ক্যাথরিন কুচতা-হল্বলিং, লরেন্স লেসার, জেসিকা লিবার ম্যান, গ্রেগরি ম্যাগিও, মাইকেল মিশেনার, জেনি মিউনোজ, ড্যানিয়েল এল নাডেল, ক্যাথরিন নিউলিং, এমিলি অসওয়েল, পিটার সচিন, অ্যামি শমিসিওর, প্যাটরিসিয়া মিকস শনেল, সোনাম শাহ, ওয়েন্ডি সিলভারম্যান, মেলিসা সিমস, জেমস টড, টেরি ট্রেসি, নিকোল উয়িলেট, হুইটনি উইলসন, সুজান ইউন্টচি, ও রবার্ট জুয়েল্ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন, লিন ডেভিডসন প্রদায়ক সম্পাদক, এলিস বয়র, অ্যডরিন বোরি, ক্যারেন চেন, ক্যারল ফিনারটি, মরিন গ্যাফনি, সিলভিয়া হ্যামন্ড, নোয়েল হার্টলি, লরা জর্ডান, ডেভিড পেরেজ, লিন্ডসে রবনসন, নিকোল বিবিনস সেডাকা, জুলি শর্ট, নোরা ভ্যাকারিউ, এমিলি ওয়েভার, ইভা উয়িগোল্ড ও মেলিক ইয়েতকেন সম্পাদনা সহকারি; এবং টেকনিক্যাল সাপোর্টে ছিলেন লিন্ডা সি হায়েস, পল স্কজিলাস ও টানিকা এন উইলিস।

**বাংলাদেশ**

বাংলাদেশ ১৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ অধ্যুষিত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রধান খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করেন ২৭ অক্টোবর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, যাদের হাতে ২০০৭ এর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্বও এই নাগরিক কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকে।

সরকারের মানবাধিকার সংক্রান্ত রেকর্ড খুবই খারাপ, এবং সরকার চরম মাত্রার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা ঘটায়। এসবের মধ্যে আইনবহির্ভূত হত্যা, হয়রানিমূলক গ্রেফতার ও ডিটেনশান, এবং রাজনৈতিক সহিংসতা উল্লেখযোগ্য। নিরাপত্তা বাহিনী বিচারের আওতার বাইরে থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়। তদুপরি সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন দেখতে পাওয়া যায়। সরকারের ভেতর দুর্নীতি একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নারী ও শিশু পাচারের মতই অপ্রতিরোধ্য থেকে যায়।

**মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা**

সেকশন-১ ব্যক্তিসত্ত্বাকে রক্ষার কথা বলে,

**ক. আইন বহির্ভূত ও পরিপন্থী আচরণ থেকে মুক্তি**

নিরাপত্তা বাহিনী অসংখ্য আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটায়। পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বেআইনীভাবে অত্যাচার চালায়।

যদিও নিরাপত্তা সদস্যদের হাতে নিহতের সংখ্যা কমছিল (সেকশন ১.ক দেখুন), প্রায় সব ঘটনাই শুধু প্রশাসনিক তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সূত্র থেকে জানা যায়, কোনো ঘটনাই অপরাধমূলক শাস্তির আওতায় আনা হয়নি এবং দু' একটি ক্ষেত্রে চার্জ দাখিল করা হলেও অভিযুক্তদের শাস্তি পূর্ণ পরিকল্পিতভাবেই প্রশাসনিক উপায়ে করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নিপীড়ন ও হত্যা

বন্ধের কোনো পরিবেশই তৈরি হয়নি। সংবাদ মাধ্যম ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হিসেব মতে, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে অথবা পুলিশি অভিযানের সময়ে ঘটে থাকে। অন্য দিকে সরকার অনেক চিহ্নিত সন্ত্রাসীর মৃত্যুকে হেফাজতে অথবা পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীচক্রের বন্দুকযুদ্ধের সময়ে ক্রসফায়ারে নিহত বলে বর্ণনা করে।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ক্রসফায়ার র‍্যাবের আইন বহির্ভূত হত্যার সমার্থক হয়ে ওঠে। ক্রসফায়ার বিষয়ক প্রেস রিপোর্টগুলো সব একই ধরনের, র‍্যাবের সদস্যরা সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে, এরপর তাকে নিয়ে অস্ত্র বা অন্য সদস্যদের পাকড়াও করতে গিয়ে পালিয়ে যাবার সময় ক্রসফায়ারে নিহত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ৩৫৫ জন নিহত হয় যার মধ্যে ২৯০ জনকে ক্রসফায়ারে নিতে দেখানো হয়। র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে ১৮১ জন, পুলিশের হাতে ১০০ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ৯ জন নিহত হয়। ২০০৪ সালে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় র‍্যাবের ক্রসফায়ার ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুকে হেফাজতে মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হবে না বলে ব্যাখ্যা দেয়ার পর থেকে কোনো র‍্যাব সদস্যকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাধারণ নাগরিকরা র‍্যাবের বিরুদ্ধে এই বছর ১৪৫টি অভিযোগ দায়ের করেছে। বছর শেষে ৪৫টিকে খারিজ করা হয়েছে এবং বাকিগুলো ঝুলে আছে।

জানুয়ারি এবং এপ্রিলের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুতের ঘাটতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ১৭ জনকে হত্যা করে ১০০ জনকে আহত করে। রাজশাহীর বিভাগীয় পুলিশের উপ মহাপরিদর্শক এই হত্যাকান্ডে ভূমিকার জন্য শিবগঞ্জ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহাবুদ্দীন খলিফাকে বরখাস্ত করে।

মার্চের ৯ তারিখে র‍্যাব সদস্যরা আদালতের শুনানি শেষে বের হবার সময় ঈমান আলীকে গুলি করে হত্যা করে। র‍্যাব ইউনিট এটিকে ক্রসফায়ার বলে দাবি করে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা এই দাবির প্রতিবাদ করে। ২২ মার্চ ঈমানের ভাই নজরুল ইসলাম মেট্রোপলিটন সেশন জজের আদালতে একটি পিটিশন দায়ের করে এই মর্মে যে, তার ভাইকে র‍্যাব সদস্যরা হত্যা করেছে। বছর শেষেও এই মামলার কোনো তদন্ত হয়নি।

এশিয়া হিউম্যান রাইটস কমিশনের (এএইচআরসি) সূত্র মতে, ১ সেপ্টেম্বর র‍্যাব সদস্যরা খুলনায় আব্দুল হাওলাদার এবং মোঃ শামীমকে গুলি করে হত্যা করে। র‍্যাব দাবি করে হাওলাদার ও শামীম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতারণা করত। স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংগঠন এর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। র‍্যাব কর্মকর্তারা দাবি করে, হাওলাদার ও শামীমকে গ্রেপ্তারের পর বড় খালপাড় এলাকায় নিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা র‍্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি করে, র‍্যাবও পাল্টা গুলি করে। বছর শেষে এই মামলারও কোনো তদন্ত হয়নি।
২০০৫ সালে আওয়ামী লীগ সদস্য আব্দুল কালাম আজাদ হত্যার বিচার চেয়ে তার পরিবার পিটিশন দায়ের করলে জুনে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত আব্দুল কালাম আজাদের মামলার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। বনশ্রীতে ২০০৫ সালের মে মাসে যুবলীগ সদস্য সুমনের লাশ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বাধীন মানবাধিকার কর্মীদের র‍্যাব সুমনকে তার কর্মস্থলে আটক করেছে, অন্যদিকে র‍্যাব সদস্যরা বলেছে, সুমন সন্ত্রাসীদের সাথে কাজ করছিল এবং সে ক্রসফায়ারে মারা গেছে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ হেফাজতে দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যুর কোনো কিছুই হয়নি, ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে খন্দকার ইকবাল হোসেনের আইন বহির্ভূত হত্যা, অথবা ২০০৪ সালে র‍্যাবের হাতে সুমন আহমেদ মজুমদার ও পিচ্চি হান্নান হত্যারও একই অবস্থা।

দেশের রাজনীতিতে সংঘাত ও এর ফলশ্রুতিতে মৃত্যু স্বাভাবিক একটি ঘটনা ছিল (সেকশন ১. গ এবং ৩ দেখুন)। ভিন্ন দলের সমর্থক বা একই দলের ভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা একে অন্যের সাথে বা সমাবেশ-মিছিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসেব মতে, উক্ত বছরে রাজনৈতিক সংঘাতে ২২৪ জনের মৃত্যু এবং ১৩,১৫২ জন আহত হয় (সেকশন ১. গ, ১.ঘ ও ২.ক দেখুন)।

২ জুলাই বিরোধীদল আহুত একটি পরিবহন ধর্মঘটে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ও একজন বিরোধীদলীয় কর্মী নিহত হয় (সেকশন ২.খ দ্রষ্টব্য)।

সেপ্টেম্বরে দুটি ঘটনায় পুলিশ ও বিরোধীদলীয় কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েক'শ আহত হয় (সেকশন ২.গ দ্রষ্টব্য)। ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আফতাব আহমেদকে তার বাসভবনে দুস্কৃতিকারীরা গুলি করে। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আফতাব তৎকালীন সরকারদলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন। পুলিশ তাই এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে সন্দেহ করেছিল। বছর শেষে এই মামলারও কোনো খবর নেই।

জানুয়ারি ২০০৫ এ হবিগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া এবং আরও চারজন হত্যা মামলার অনেক রকম অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৫ এর এপ্রিলে পুলিশ কিবরিয়ার ওপর গ্রেনেড হামলার দায়ে ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে, যাদের অধিকাংশই স্থানীয় বিএনপি নেতা। এর ভেতর ৮ জনকে আটক করা হয়, বাকি দুজনকে ধরা সম্ভব হয়নি। ওই বছরেই আটককৃত আটজনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি সিলেট বিভাগীয় দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক নাকচ করে দেন। পরের দিন ট্রাইবুনাল হাকিম বাদীর সুপ্রীম কোর্টে পুনঃতদন্তের আবেদনের জন্য সময় চেয়ে পিটিশন দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে চার সপ্তাহের জন্য মুলতবি ঘোষণা করে। ৭ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টে শুনানি শুরু হয়।

সিলেটে একটি মাজারে বোমা হামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ ৩ সেপ্টেম্বর নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামির (হুজি) ৪ সদস্যকে আটক করে। তাদের ভেতর একজন কিবরিয়া হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, হুজির পরিকল্পনা ছিল দেশ থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যা করা। ঢাকা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম বাচ্চু হত্যা মামলার কোনো তদন্তই হয়নি। তিনি তার বাসার কাছেই আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন।

২০০৫ সালের আগস্টে দেশ জুড়ে বোমা হামলার সাথে সম্পর্কিত ব্যাপারে বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। সারা দেশে ৬৪ জেলার ৬৩ টিতেই বোমা ফাটানো হয়েছিল, এতে ২ জন নিহত ও প্রায় ১০০ জন আহত হয়। বোমা হামলার ঘটনাস্থলের কাছেই লিফলেট পাওয়া যায়, সদ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি

সংগঠন জামিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ইসলামী আইন (শরীয়া) প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে। বছর শেষে এই হামলার সাথে সম্পর্কিত ৬৯৮ জনকে আটক করা হয় এবং পরবর্তী টানা কয়েকটি হামলার দায় তাদেরকে দেয়া হয় (সেকশন ১ঙ দ্রষ্টব্য)। আদালত ৩২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ৬২ জনকে যাবৎজীবন ৫৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাভাই রয়েছে যে ২০০৪ সালে প্রথমে পুলিশের এবং পরে জেএমবি নেতা শায়খ আব্দুর রহমানের যোগসাজশে অপরাধ বিরোধী অভিযান শুরু করে। ঢাকায় আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার ব্যাপারেও অগ্রগতি হয়েছে। ওই হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পদিকা আইভি রহমানসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত হন এবং কয়েকশ আহত হন। ২০০৫ এর মধ্যেই কর্তৃপক্ষ এই মামলার দায়ে অভিযুক্ত করে ২০ জনকে আটক করে। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ৩ জন বাদে সবাই ছাড়া পেয়ে যায়, এবং কারো বিরুদ্ধেই কোন চার্জ গঠন করা হয়নি।

০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৪ জনকে আটক করে। ওই হামলায় কয়েকজন নিহত এবং অনেকজন আহত হয়। ৪ জনই হুজির সাথে সম্পর্কিত, এবং একজন কিবরিয়া হত্যার সাথেও জড়িত।

আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া ছিল একটি সাধারণ ঘটনা। সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, ওই বছরে এমন ৬৬টি ঘটনা ঘটেছে। সংবাদপত্রের সূত্র থেকে জানা যায়, ১১ সেপ্টেম্বর বাঁশখালির একটি বাড়িতে ডাকাত ঢুকে পড়ে। এক প্রতিবেশী স্থানীয় মসজিদের স্পীকার ব্যবহার করে গ্রামবাসীদের একত্র হতে আহ্বান জানায়। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের কয়েকজনকে ধরে ফেলে, দুজনকে হত্যা করে এবং একজনকে আহত। মে মাসের ১৮ তারিখ ৩ জন মোটর সাইকেল চুরির অভিসন্ধি করে। স্থানীয় গ্রামবাসী রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে ৩ জনকেই আটক করে। গ্রামবাসীরা তাদেরকে মারধর করে এবং সেলিম আহমেদ নামে একজন পরদিন মৃত্যুবরণ করে।

ভারতীয় সীমান্তে অপরাধ এখনো সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সূত্র মতে, ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ১৪৭ জন বংলাদেশীকে হত্যা করে এবং ১৪৪ জনকে আহত করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসেবমতে, বিএসএফ সদস্যরা এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ভারত-কেন্দ্রিক অপরাধ চক্র ২০০০ সালে প্রায় ৬০০ জনকে হত্যা করে এবং ৬৭৫ জনকে আহত করে।

**খ। গুম হওয়াঃ**

গুম এবং অপহরণ বছরের ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে রয়ে যায়। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ৪১১ জন লোক অপহরণের শিকার হয়। তাদের মতে ৪৮ জন রাজনৈতিক কারণে অপহৃত হন, ধারণা করা হয় তাদের মধ্যে ৫ জন নিহত হয়েছেন। লাভজনক কাজ হিসেবে পরিগণিত শিশু অপহরণ ও সমস্যা হিসেবেই থেকে যাবে। স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংস্থার মতে এ বছর ৯৩ জন শিশু অপহৃত হয়।

৭মে তে, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানা তারা মিয়ার অপহরণের মামলাটি নিয়ে তৎপর হতে অপারগতা প্রকাশ করে। এএইচআরসি'র (AHRC) মতে, বিগত রাতে তার অপহরণের কথা জানালেও

পুলিশ তা নথিভুক্ত (File) করতে অস্বীকৃতি জানায়। ৮ই মে গ্রামবাসী তারা মিয়ার মৃতদেহ হাওর থেকে উদ্ধার করে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য মতে, অপহরণের প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশের যথাযথ ভূমিকার অভাবেই তারা মিয়ার মৃত্যু হয়।

২২শে আগস্ট, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পি এস জে.এসএস) সমর্থকদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে ইউপিডিএফ গ্রুপ পিএসজেএসএস'র সমর্থকদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। বছর শেষে সকলকে ছেড়ে দেয়া হয়।

**গ। নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা নির্যাতনমূলক অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ**

যে ক্ষেত্রে আইন নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা নির্যাতনমূলক শাস্তিকে নিষেধ করে, নিরাপত্তা সংস্থা, র‍্যাব এবং পুলিশ সেখানে আটকের এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভয়ানক আচরণ এবং মনস্তাত্ত্বিক নিবর্তনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। নিবর্তনমূলক আচরণের মধ্যে ছিল ভীতি প্রদর্শন এবং বিদ্যুতের শক দেয়া । মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, নিরাপত্তা বাহিনী ৪৫ জনকেও এবছর নির্যাতন করেছে, তাদের মধ্যে ১৪ জন মৃত্যুবরণ করেছে। (এ জন্য দেখুন ১.ক, ১.গ এবং ২. ক)। সরকার কদাচিৎ দোষীদের বিরুদ্ধে দোষারোপ, দোষী সাব্যস্ত অথবা শাস্তি প্রদান করেছে। শাস্তি থেকে তাদের অব্যাহতি দানের কারণে পুলিশ হয়রানি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি মুন্সীগঞ্জের স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা আশ্রাফ হোসাইন খানকে র‍্যাব সদস্যরা চুরির সন্দেহে আটক করে। মানবাধিকার সংস্থার মতে, নিরাপত্তা বাহিনী খানকে ভাগ্যকূল (Vaggyakul) র‍্যাব-৮ দপ্তরে স্থানান্তর করে সেখানে তাকে চোখ বেঁধে নির্যাতন করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী খানকে শহরের বাইরে মাঠে নিয়ে আসে এবং তাকে ক্রসফায়ার করে হত্যার হুমকি প্রদান করে। স্থানীয় সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করে তার মুক্তি দাবী করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার উপর নির্যাতনের আলামত নিশ্চিত হওয়া গেছে।

**র‍্যাবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।**

২০শে জুলাই র‍্যাব সদস্যরা কিশোর কুমার দাসকে আটক করে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। র‍্যাব সদস্যরা তার বাসা তল্লাশি করে টিনের জর্দার কৌটা পায়, যা হাতে তৈরি বোমা হিসেবে র‍্যাব কর্মকর্তারা মন্তব্য করে। জুলাই ২৩ তারিখে র‍্যাব কিশোরকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। র‍্যাব দাবী করে কিশোর আটক অবস্থা থেকে পালানোর চেষ্টাকালে আহত হয়। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে কিশোরকে আটকের কারণ এবং তার আটক অবৈধ ছিল কি-না তা জানতে চায়। বাংলাদেশ বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) এর প্রেসিডেন্ট মনজিল মুরশিদ বাদী হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হলফনামা নথিভুক্ত করেন। যেখানে র‍্যাবের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দন্ডবিধি অনুসরণ না করার অভিযোগ আরোপিত হয়। মহামান্য আদালত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষত র‍্যাবকে ভবিষ্যতে ফৌজদারী দন্ডবিধি অনুসারে আটকের আদেশ দেয়।

২২শে জুন, এএইচআরসি-র, মতে, পুলিশ কুড়িগ্রাম জেলার তাজুল ইসলামকে আটক করে। যখন তার ভাই কাসিম উদ্দিন ইসলামকে মুক্তির আবেদন জানাতে থানায় যায়, সাব-ইন্সপেক্টর তার যৌনাঙ্গে সজোরে লাথি মারে। একইভাবে পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা তাকে লাথি মারতে মারতে হত্যা করে। কুড়িগ্রাম জেলা কর্মকর্তারা বলেন, কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা এসআই হাকিমকে আটক ও বরখাস্ত করা হয়। উদ্দিনের পরিবার থানা থেকে তার ময়না তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারেনি।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক দু'টি ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে। অধিকাংশ এনজিও বিশ্বাস করে যৌন নির্যাতনের সংখ্যা তার থেকেও বেশি। সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। জুলাই, ২০০৫ নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার অগ্রগতি হয়। জুলাই ২০০৫, একজন দাঙ্গা পুলিশ নুরুল ইসলাম, ঢাকার বাস স্টেশনে এক মহিলাকে দেখতে পান যিনি সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন।

তাকে পুলিশী সহায়তায় বাড়িতে পৌঁছানোর পরিবর্তে সে মহিলাকে একটি হোটেলে এনে হোটেল কর্মচারীর সহায়তায় তাকে ধর্ষণ করে। মহিলাটি ধর্ষণ মামলা রুজু করলে নুরুল ইসলাম ও হোটেল কর্মচারী ধৃত হয়। বছরের শেষার্ধে তাকে কারাগারে বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয় এবং হোটেল কর্মচারীকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ধর্ষণ বা নির্যাতন মামলাগুলো সাধারণতঃ তদন্ত করা হয় না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ মহিলাকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়, কিন্তু ঐ নিরাপদ হেফাজত বলতে বোঝায় দুর্বিষহ পরিবেশে রেখে পুনরায় ধর্ষণ করা। (দেখুন ধারা-৫)

জেল এবং নিরোধ কেন্দ্রের অবস্থা

জেলের অবস্থা হতাশাজনক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বন্দী মৃত্যুর অন্যতম উদগাতা। সংবাদ মাধ্যমের সূত্র মতে, ৫২ জন জেলে মৃত্যুবরণ করে এবং ১৬২ জন পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুবরণ করে। (দেখুন ধারা ১.ক)

জেলখানাগুলো অতিরিক্ত লোকজনে ভরপুর এবং সেখানে কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান রাইটস (বিএসইএইচআর) এর হিসেব মতে, বর্তমানে জেলখানায় ৭২.০১৩ জনকে রাখা হয়েছে, যা বিদ্যমান সরকারী হিসেবের ২৫০ শতাংশ অতিরিক্ত কারাগারের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৩,৬৫৯ জন হয়ে দোষী, কিন্তু বাকীদের বিচার হয় প্রক্রিয়াধীন আছে নতুবা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সেলের অবস্থা এত নাজুক যে, কয়েদীদের পালাক্রমে ঘুমাতে হয়।

আইনগতভাবে নিয়ম রয়েছে যুবকদের ও বয়স্কদের ভিন্ন জায়গায় রাখতে হবে; কিন্তু, সুযোগ সুবিধার স্বল্পতায় তাদেরকে বয়স্কদের সাথেই তাদের রাখা হয়।

যদিও আইনগতভাবে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা মহিলাদের দুস্কৃতিপরায়ণ মহিলাদের সাথে না রাখার কথা থাকলেও কার্যতঃ স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে তাদেরকে মিশ্র অবস্থায় রাখা হচ্ছে একসাথে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন মানবাধিকার সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি রেডক্রস (আইসিআরসি)কে কয়েদীদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয় না।

সরকার নিযুক্ত বিশিষ্ট জনদের একটি কমিটির মাসওয়ারী কারা পরিদর্শনের সুযোগ থাকলেও তাদের রিপোর্ট কোনভাবেই প্রকাশিত হয় না। জেলা জজ মাঝে মাঝে কারা পরিদর্শন করলেও কদাচিৎ তিনি তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

**ঘ. স্বেচ্ছাচারী আটক অথবা অবরুদ্ধকরণঃ**

আইন স্বেচ্ছাচারী আটককে নিষিদ্ধ করলেও কর্তৃপক্ষ প্রায়শঃ আইনের এই ধারা মেনে চলেন। এমনকি নন প্রিভেনটিভ অবরুদ্ধ মামলাগুলোর ক্ষেত্রেও। আইন প্রতিকারমূলক ডিটেনশনকে শর্তসাপেক্ষে, যেমন, ম্যাজিস্ট্রেটের কোন ব্যক্তিকে তার সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য আটক করতে পারেন।

সরকার বিভিন্ন জনকে আটক এবং অবরুদ্ধ করেছে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে জাতীয় নিরাপত্তামূলক আইন যেমন, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন দ্বারা। এ ক্ষেত্রে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অভিযোগপত্র দাখিল না করেই কোন নাগরিককে আটক এবং অবরুদ্ধ করতে পারেন।

পুলিশ এবং নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত অনুষঙ্গঃ

পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বৈধ সংস্থা। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তদন্ত করতে অনিচ্ছা পোষণ করে এবং অকার্যকর ভূমিকা পালন করে। এবং সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হামেশা ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাব উন্নত আধা সামরিক বাহিনী যেটি পুলিশসহ অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সদস্য নিয়ে গঠিত, উদ্দেশ্য হলো পুলিশ কাঠামোতে সংস্কার ঘটানো, কিন্তু মানবাধিকার সদস্যকে বিবেচনায় আনার জন্য সীমিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। র‍্যাব বড় ধরনের মানবাধিকার লংঘনে জড়িত ছিল। পুলিশে ব্যাপক ভিত্তিক দূর্নীতি এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ তুচ্ছ ঘটনায় রিকসা চালককে লাঠি পেটা করে এবং রিক্সার চাকার বাতাস ছেড়ে দেয়। জয়েন্ট ড্রাইভ ইনডেমনিটি অ্যাক্ট, যেটি অপারেশন ক্লিন হার্ট, ২০০৩ সালে কার্যকর হয়-এর ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোন প্রতিকার চাওয়া যাবে না।

পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, ২রা অক্টোবর, পুলিশ ঢাকাস্থ জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে ক্লাবের ২৫ জন সদস্যকে নিমর্মভাবে পেটায়, এদের মধ্যে রয়েছে কমনওয়েল্থ গেমস এ স্বর্ণজয়ী আসিফ হোসাইন খান।

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় এভাবে পুলিশের বিশেষ শাখার উপ মহাপরিদর্শক (DIG) সাদিকুর রহমানের স্ত্রীকে বহনকারী গাড়িটি কমপ্লেক্সের সামনে পার্ক করা ছিল। ক্লাবের রক্ষী চালককে অন্যত্র সরাতে বললে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংবাদপত্রের তথ্য মতে, গুলশান থানার ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) ওবায়দুর রহমান খান এবং সাবইন্সপেক্টর জসিমের নেতৃত্বে পুলিশ এসে ক্লাবের সদস্যদের উপর নির্মম লাঠি চার্জ করে। আসিফসহ আরও পাঁচজনকে পুলিশ গুলশান থানায় নিয়ে যায়। আসিফের তথ্য মতে, পুলিশ আসিফকে লাঠি দিয়ে নিমর্মভাবে পেটায়। তাদের কেউ কব্জিতে আহত, কেউ মাথায় এবং অন্যত্র আহত অবস্থায় পাঁচ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ ক্লাবের সদস্য আসিফসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। বছর শেষে পুলিশের আচরণের কোন তদন্তই আর হয়নি। পুলিশের রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট প্রতিবেদন বের হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রতিবেদন অনুযায়ী আগস্ট মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকল জেলার জেলা প্রশাসকদের কাছে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে বিগত তিনটি নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের কি কি ঘাটতি ছিল এবং বিজিত প্রার্থীদের ইতিবাচক দিকগুলো জানতে চায়। সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ নিব পদস্থ অফিসার দিয়ে এ সমস্ত ডেটাগুলো সংগ্রহ করে। এরকম সময়ে পুলিশ প্রায়ই বিনা প্ররোচনায় মিছিলের উপর নির্মমতা প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, ৩০ মার্চ, পুলিশ ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটকারীদের উপর আক্রমণ করে। সেখানে প্রতিবাদকারীরা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অবস্থান কর্মসূচী পালন করছিল।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে, পরে বিক্ষোভকারীদের উপর টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে। বিক্ষোভ সচিবালয় এলাকা থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন বিক্ষোভকারী, পুলিশ এবং সাংবাদিকসহ ১০০ জনেরও বেশি লোক দিনব্যাপী সংঘর্ষে আহত হয়।

২৬শে আগস্ট ফুলবাড়িয়াতে কয়লাখনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত জনগণের উপর পুলিশ ও বিডিআর জওয়ানরা গুলি চালালে পাঁচ ব্যক্তি নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। বেশ কদিন সংঘর্ষের পর সরকার অবশেষে বিক্ষোভকারীদের সাথে আপোষ করে এবং কয়লা খনিটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পুলিশ, বিডিআর ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী হত্যার কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

বাদী পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করতে ভয় পায় কেননা মামলাগুলো যেমন দীর্ঘসূত্রী, তেমনি বাদীর পরিবার পরিজন ও প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন। এমন ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকেন। এই পরিস্থিতি পুলিশের কাছ থেকে সুবিচার প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

**আটক এবং জেল ঃ**

সকল আইনে পরোয়ানার সুযোগ নেই। ফৌজদারী দন্ডবিধির ধারা ৫৪ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ এর ৮৬ ধারায় সন্দেহমূলক যে কোন ব্যক্তিকে হাকিমের আদেশ অথবা গ্রেফতার পরোয়ানা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করতে পারে, এর ফলে সরকার হামেশা বিভিন্ন লোকজনকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়া আটক করছে। ১৪৪ ধারা মতে চার জনের বেশি কেউ সমবেত হতে পারবে না। কর্তৃপক্ষ সেই ধারার অপব্যবহার করেছে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত গণগ্রেফতার করেছে। সরকারি পরিসংখ্যান মতে, র‍্যাব এপ্রিল ২০০৪ থেকে ১১,০০০ জনকে আটক করে, যাদের মধ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী রয়েছে। অধিকারের প্রতিবেদন মতে, ৫৪ ধারায় ৩,৯০০ জনকে পুলিশ আটক করে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) মতে পুরো বছরে ১৬৪ বার ১৪৪ ধারার অপব্যবহার করে চার জনের অতিরিক্ত সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

সরকারের মতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন অভিমত পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে ৫৪ ও ৮৬ ধারা মতে নিবর্তনমূলকভাবে অন্তরীণ করা হয়েছে। এএসকে'র তথ্যমতে, সারা বছরই পুলিশ বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের কর্মসূচীর আগে আটক করে। এ ক্ষেত্রে আইনী বাধ্যবাধকতা কম প্রযুক্ত হয়েছে।

অধিকার'এর প্রতিবেদন মতে, এক বছরে ২৮,৬৫১ জন ব্যক্তিকে গণগ্রেফতার করা হয়। ১৪টি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য মতে, ১১ই জুন সরকার বিরোধীদলের আসন্ন সমাবেশকে সামনে রেখে ঢাকায় গণগ্রেফতার চালায়।

এই সংস্থাগুলোর তথ্য মতে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্লক রেইডের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় চেক পয়েন্ট বসিয়ে আগত কর্মীদের মধ্য থেকে ৭০০ জনকে আটক করে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসেব মতে, ঢাকায় আসন্ন সমাবেশকে সামনে রেখে ঢালাওভাবে বিরোধী দলীয় কর্মীদের আটক করা হয়। তাদেরকে পুরনো মামলা অথবা চুরির মামলা দিয়ে আটক করা হয়। অধিকাংশই পরে ছাড়া পায়। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায় যে, ঢাকায় বিরোধীদলের সমাবেশে তারা যেন অংশ নিতে না পারে, সেজন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে পুলিশ সারা দেশ থেকে ১৭২ জন এনজিও কর্মী আটক করে যারা প্রশিকায় কর্মরত। সরকারের এই অভিযানের কারণ হলো, সরকারের ধারণা ছিল ১২ই সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিরোধীদল যে ঘেরাও কর্মসূচী দিয়েছিল, প্রশিকার কর্মীরা তাতে অংশগ্রহণ করতো। অভিযুক্তরা অন্তরীণ হয় চুরি, মাস্তানী ও সম্পদ অনিষ্টের অজুহাতে। কর্মচারীরা আটক হবে এই কারণে সরকার প্রশিকার ২০০ কার্যালয় বন্ধ করে দেয়। প্রশিকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে তাদের সকলকেই জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে সরকার অথবা জেলা প্রশাসক যে কোন ব্যক্তিকে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি মনে করলে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক রাখতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে ত্রিশ দিনের বেশি আটকে রাখা হয়।

এই ক্ষেত্রে হাকিম অবশ্যই আটক ব্যক্তিকে আটকের কারণ অবহিত করবেন এবং একটি উপদেষ্টা বোর্ড থাকবে যারা আটকের চার মাস পর আটক ব্যক্তির মামলাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। আটক ব্যক্তির আপীল করার অধিকার থাকবে।

নিয়মিত আদালতে জামিনের ব্যবস্থা থাকলেও নিরাপত্তা ও ফৌজদারী আইনে একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যেখানে জামিন মঞ্জুরের কোন সুযোগ নেই। দুস্কৃতিকারী আটক ব্যক্তি আইনজীবীর শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ থাকলেও উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্বের কোন সুযোগ নেই। রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিচালিত আত্মপক্ষ সমর্থনকারী আইনজীবীদের বলতে গেলে নিযুক্তই করা হয়নি এবং আইনগত সহায়তার জন্য খুবই সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করার পরই কেবল তাদের জন্য আইনজীবী নিযুক্ত করা হয়। ৫৪ ধারায় আটক ব্যক্তির সাথে আইনজীবী দেখা করার অনুমতি থাকলেও বাস্তবে আইনের উক্ত ধারায় আটক ব্যক্তির সাথে আইনজীবীদের দেখা সাক্ষাৎ খুব সামান্য করতে দেয়া হয়েছে। যথেচ্ছ আটক ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ধারাবাহিক আটকাদেশ প্রদান করে।

সরকার ৫৪ ও ৮৬ ধারা প্রয়োগ করে বিরোধী দলের সদস্য ও তাদের পরিবারকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন করে। সমাবেশ করার আগে এবং সমাবেশ করার সময় পুলিশ কোন প্রকার আইনগত কর্তৃত্ব প্রদর্শন ব্যতিরেকে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আটক ও অন্তরীণ করে যতক্ষণ না সমাবেশ শেষ না হয় (দেখুন ধারা ২. খ)।

রাজনৈতিক কারণে কতজনকে আটক করা হয়েছে তার সংখ্যা নিরূপিত না হলেও অনেক কর্মীকে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অনেক দুস্কৃতিকারী রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবী করে। এই ধরনের আটক কিছু দিন নয়ত সপ্তাহখানেক থাকে এবং এই সব মামলায় বিবাদী অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামিন পায়। বেকসুর খালাস বা মিথ্যা অভিযোগের নিস্পত্তি হতে অনেক বছর দীর্ঘায়িত হয়। স্বেচ্ছামূলক এবং দীর্ঘ সূত্রী প্রাক আটক একটি বড় সমস্যা হিসেবেই রয়ে যায়।

এক ঢাকাতেই কমপক্ষে ৪৩,০০০ ফৌজদারী মামলা জমে আছে এবং আইন মন্ত্রণালয়ের একটি হিসেব মতে ১,২০০ কারাবাসী রয়েছেন, যাদেরকে বিগত ছয় মাসেই আদালতে হাজির করা হয়নি এবং অনেকই বিচার পূর্ব দীর্ঘদিন জেলে অন্তরীণ আছেন যা তার মূল সাজা থেকে বেশি হয়ে যায়। অধিকার-এর তথ্য মতে ৭৫ শতাংশ আটক ব্যক্তির আটক বিচার পূর্ব।

### ঙ. জন সমক্ষে নিরপেক্ষ বিচার পরিচালনা ঃ

আইনে বলা হচ্ছে স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানের দীর্ঘদিন প্রচলিত স্বল্পমেয়াদী যে বিধান, তাতে নির্বাহী ব্যক্তির অধীনে নিব আদালত পরিচালিত হয় এবং আদালতে নির্বাহীর প্রভাব বেশি হওয়ার কারণে বিচারপতির নিয়োগ এবং বেতন ও নির্বাহীর উপর নির্ভরশীল।

বিচার বিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখা যায় এবং অনেক সময় সরকারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী সাধারণ ও রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলোর বিরুদ্ধে বিধি জারি করে।

দুর্নীতি, বিচারের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধহীনতা, বিচারকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হামলা সমস্যা হিসেবে রয়ে যায়। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে আত্মঘাতী আক্রমণে ঝালকাঠিতে দুই বিচারক নিহত হয়। একই মাসে চারজন আত্মঘাতী চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে আত্মঘাতী আক্রমণ চালিয়ে দুই জন পুলিশ সদস্যকে এবং গাজীপুরের আদালত পাড়ায় বেশ ক'জন উকিলকে হত্যা করে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর অজ্ঞাতনামা আক্রমণকারী গাজীপুরের আদালত পাড়া সংলগ্ন মিউনিসিপ্যাল কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। মে'র ২৯ তারিখে বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ঝালকাঠিতে অঘটন ঘটানোর দায়ে বাংলা ভাই ও শায়খ আব্দুর রহমানসহ সাতজনকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন (দেখুন ধারা ১.ক.) ।

আদালতের দুটি স্তর রয়েছে- নিব আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট। উভয় স্তরেই দেয়ানী ও ফৌজদারী মামলার শুনানী হয়। নিব আদালত গঠিত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে যারা নির্বাহী বিভাগের অংশ এবং সেশন ও জেলা জজদের নিয়ে যারা বিচার বিভাগীয় শাখার অংশ। সুপ্রীম কোর্ট দুই অংশে বিভক্ত হাই কোর্ট ও আপীল কোর্ট। হাইকোর্ট শাসনতান্ত্রিক বিষয় জড়িত এমন মামলার শুনানী এবং নিব আদালতের মামলার পুনর্মূল্যায়ন করে থাকে। আপীল কোর্টের আওতায় রয়েছে বিচারের আবেদন, রায়, আদেশ অথবা হাইকোর্টের দস্তাফেকের শুনানী। আপীল কোর্টের আদেশ মান্য করা অন্যান্য সকল কোর্টের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার বিলম্ব করতে থাকে। অক্টোবর ২০০৫ মাসে সুপ্রীম কোর্ট সরকারের ২১তম সময় বর্ধনের আবেদন নাকচ করে দেয়। তবে বৎসরের শেষে সরকার নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের আইন পাকা অথবা এ সিদ্ধান্ত পরিচালনের রীতি পদ্ধতি প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। ২০০৫ এর সেপ্টেম্বরে হাইকোর্টের একটি প্যানেল ১৯৮০ এর দশকে মার্শাল ল'কে বৈধতা দেয়ার জন্য শাসনতন্ত্রের যে সংশোধনী আনা হয় তাকে অসাংবিধানিক বলে আদেশ প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই আদেশ স্থগিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর মৃত স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকার তাকে বহন করতে হচ্ছে।

**বিচার পদ্ধতি ঃ**

আইন অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরামর্শক নিয়োগের অধিকার দিয়েছে যাতে তারা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বস্তুর মূল্যায়ন, সাক্ষী ডাকা এবং রায়ের বিপরীতে আপীল করতে পারে। বিচারের জন্য কোন জুরী নেই। সকল মামলার বিচার বিচারকগণ করে থাকেন। বিচার কার্য প্রকাশ্যে পরিচালিত হয় এবং বিবাদীর অধিকার রয়েছে আইনজ্ঞ নিয়োগের। তবে রাষ্ট্রের খরচে কদাচিতই আইনজ্ঞ নিয়োগ হয়ে থাকে। জননিরাপত্তা আইনে আইন শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী বেআইনী কাজের দ্রুত বিচার আইন, মহিলা ও শিশু নির্যাতন আইন ইত্যাদির আওতায় বিশেষ ট্রাইবুনাল মামলার শুনানী করে এবং রায় প্রদান করে। এই সকল আইনের আওতায় মামলাসমূহ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও বিচার সম্পন্ন করতে হবে। তবে এই সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন না করা হলে এই সকল মামলার অবস্থা কী দাঁড়াবে তা সম্পর্কে এই আইনে

পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। বিবাদীপক্ষকে ধরে নেয়া হয় নিষ্পাপ। তাদের অধিকার রয়েছে আপীল আবেদন করার এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের যে সাক্ষ্য রয়েছে তা দেখার।

আদালতের পদ্ধতি দুর্নীতি জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং অনিষ্পন্ন মামলার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। প্রলম্বিতভাবে চলমান থাকা মামলার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সাক্ষীর সাক্ষ্যদানে হস্তক্ষেপ, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন, সাক্ষী হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে এ অবস্থায় অনেক ব্যক্তিই উপযুক্ত বিচার পেতে বাধাগ্রস্ত হন। ২০০৪ এর সেপ্টেম্বরে ট্র্যান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের এক জরিপে প্রকাশিত হয় যে দ্রুত বিচার আইনের আওতায় রুজুকৃত মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালত কর্মকর্তাগণ ৬৭ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে বিবাদীর নিকট থেকে ঘুষ দাবি করেছে (দ্রষ্টব্য সেকশন-১ ডি)।

২০০৪ এর জুলাই মাসে দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ মীমাংসা (এডিআর) পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়ে সংসদে আইন পাস হয় এবং এর ব্যবহার সিলেট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এডিআর নাগরিকদেরকে এই সুযোগ দিয়েছে যে তারা মামলা রুজু করার আগে মীমাংসা করার জন্য তা উপস্থাপন করতে পারে। সরকারি উৎস মতে দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপকতর ব্যবহারের দরুণ এই বিচার ব্যবস্থাকে দ্রুততর করেছে। এডিআর পদ্ধতির ব্যাপারে জনপ্রিয় আবেদন থাকলেও কোন স্বাধীন সত্তা এর ন্যায্যতা বা পক্ষপাতহীনতার বিষয়ে মূল্যায়ন করেনি। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ঐতিহ্যগত ইসলামী আইনকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং তালাকের ক্ষেত্রে আইন হিসাবে গ্রহণ করেছে। একই ক্ষেত্রে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ আইন রয়েছে।

**রাজনৈতিক বন্দী ও আটককৃত ব্যক্তিগণ ঃ**

সরকার বলেছে যে কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক করেনি। তবে বিরোধী দল এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীগণ দাবি করেছে সরকার অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদেরকে অযৌক্তিক ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত করেছে। (দ্রষ্টব্য সেকশন ১.ডি)। এনজিওদেরকে বন্দীদের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি।

২০০৫ এর এপ্রিলে ঢাকা কোর্ট সাংবাদিক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীকে জামিন প্রদান ও মুক্তি দেয়। তাকে ২০০৩ সালে ইসরায়েল ভ্রমণের চেষ্টার দায়ে বিমান বন্দর থেকে আটক করা হয়েছিল। চৌধুরী দাবি করেছে ২০০৩ সালে তার বন্দিত্ব শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫ মাসের বন্দিত্বকালে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার বিষয় নির্ধারিত থাকলেও তা মুলতবি করা হয়।

**সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ঃ**

এই বছর সরকার ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, যার মূল কথা হল সম্পত্তি তার মালিককে প্রত্যর্পণ করা, বিশেষত হিন্দুদের, যাদের জমি ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় দখল করেছিল। প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমি হিন্দুদের কাছ থেকে দখল করা হয়েছিল এবং দেশের এক কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রায় সকলের উপর এর প্রভাব পড়েছিল। ২০০১ সালের এপ্রিলে সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হয়েছিল, এই শর্ত

সাপেক্ষে যে, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যেসব জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় দখল করা হয়েছিল সেগুলো তাদের প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেয়া হবে যদি প্রকৃত মালিক বা তাদের উত্তরাধিকারীরা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নাগরিক হয়ে থাকে। সরকারের প্রয়োজন ছিল ২০০১ সালের অক্টোবরের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা তৈরি করা। ২০০২ সালে সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের একটি সংশোধনী পাস হয় যা সরকারের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সীমাহীন সময় নেওয়ার এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তি ইজারা দেয়াসহ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়াকে অনুমোদন করে সরকার তার নিয়ন্ত্রণাধীন অর্পিত সম্পত্তির কোন তালিকা ছাপায়নি এবং এর ফলে প্রকৃত জমি মালিকরা তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি পুনঃরুদ্ধার করতে পারেনি।

**চ. গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ অথবা যোগাযোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ-**

এই আইন গোয়েন্দা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর অনুমতিক্রমে টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড করার অনুমতি প্রদান করে। এছাড়া এই অধ্যাদেশ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে টেলিফোন অপারেটরদের সংবাদ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকারকে বাধা প্রদানের কর্তৃত্ব দিয়েছে। জাতীয় জরুরী অবস্থায় সরকার কোন লাইসেন্সধারীকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যোগাযোগ সেবা প্রদানের অনুমতি বাতিল করতে পারে। এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হয়েছে সংসদের বিরতির সময় কিন্তু সংসদ পুনরায় আরম্ভ হলে যথাশীঘ্র সম্ভব অবশ্যই একে স্থায়ী আইনরূপে অনুমোদিত হতে হবে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ হুকুম নামা ছাড়াই গ্রেপ্তার করে এবং এক্ষেত্রে রীতিভঙ্গকারী কর্মকর্তার কোন শাস্তি হয় না। আরএসএফ দাবি করে যে পুলিশ সাংবাদিকদের ই-মেইল পরীক্ষা করত। পুলিশের বিশেষ শাখা, জাতীয় খাতে দেখা যায় পুলিশ যেসব লোকদের খুঁজছে তাদের সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য পুলিশ তাদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিকভাবে অপদস্ত কিংবা আটক করেছে।

**ছ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ঃ**

আইন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সরকার এ সকল অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। হয়রানির ভয় ব্যতিরেকে লোকেরা সর্বদা প্রকাশ্যেও সরকারের সমালোচনা করতে সক্ষম না এবং রাজনৈতিক সমাবেশ প্রায়ই নিষিদ্ধ কিংবা ছত্রভঙ্গ করে সরকার সমালোচনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

শত শত স্বাধীন দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কাজকর্মের বিষয়ে অনেক সংবাদপত্রই মাঝে মাঝে সমালোচনা মুখর হয়। নিরাপত্তা গোয়েন্দা এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসহ পরিচালকের তরফ থেকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ব্যক্তিদের উপর নজরদারী এবং তদ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য।

**সরকার বলপূর্বক মানুষকে পুনর্বাসন করে ঃ**

প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ঢাকার ধলপুর এলাকার বস্তিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের বসতবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দুই প্লাটুন পুলিশ এবং ৩০ জন উচ্ছেদ শ্রমিক এই উচ্ছেদ কাজে অংশগ্রহণ করেছে। উচ্ছেদকৃত লোকেরা এই উচ্ছেদ কাজের প্রতিবাদ করেছে।

প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২১শে জুন সরকারি আধা স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধসহ গুলশান এলাকার কয়েক হাজার বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করে। পরবর্তীতে বস্তিসমূহকে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। উচ্ছেদকৃত লোকেরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ তা থামানোর জন্য লাঠি চার্জ করে।

পুলিশ যেসব লোকদেরকে খোঁজে, কখনো কখনো সেসব লোকদের পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখায়। এ বছর এমন উদাহরণও রয়েছে।

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরকারের প্রত্যক্ষ বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ নয়। সরকারি একটি রেডিও কয়েকটি টিভি স্টেশনের মালিক অথবা এগুলোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

গত বছরগুলোর মত, এই স্টেশনগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারের উপর আলোকপাত করেনি। ছয়টি প্রাইভেট স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল পরীক্ষামূলকভাবে দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য তাদের সম্প্রচার শুরু করেছে। এ ছাড়াও দুটি বিদেশ ভিত্তিক ও লাইসেন্সধারী স্যাটেলাইট টেলিভিশন স্টেশন দেশের মধ্যে সম্প্রচার করা হয় এবং দেশীয় খবরাখবর সম্প্রচার করে। কেইবল অপারেটরেরা সাধারণত সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাদের কার্যক্রম চালায়। তবে ট্যাক্স না দেয়ার অভিযোগে কেইবল অপারেটরা কতিপয় বিদেশি চ্যানেল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। চালু রাখার শর্তানুসারে সকল প্রাইভেট স্টেশনকে চার্জ ছাড়াই কতিপয় সরকারি সংবাদ এবং প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্প্রচার করতে হয়।

সরকার, রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং অন্যান্যদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ এবং তাদের ভয় দেখিয়ে বশে আনার ঘটনা ঘনঘন ঘটেছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনা খুবই সাধারণ এবং অনেক সাংবাদিক পুলিশ কর্তৃক আহত হয়। অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর একজন সাংবাদিক হত্যা করা হয়, ১৮৩ জন সাংবাদিক আহত হয়, ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, ৫৩ জনকে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং ১১৪ জন হুমকির শিকার হয়।

আন্তঃদেশিয় সংবাদ প্রতিবেদক (RSF) কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর পরিচালিত ২০০৫ এর র‍্যাঙ্কিং-এ ১৬৭ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হয়েছে ১৫১তম। এই র‍্যাঙ্কিং এ সাংবাদিক ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার অভাব এবং এই স্বাধীনতার প্রতি সম্মান করা ও সম্মান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি প্রতিফলিত হয়।

জানুয়ারির ১৩ তারিখে পানছড়ি প্রেসক্লাব সভাপতি এবং দৈনিক সমকালের প্রতিনিধি এস চাঙ্গমা সত্যজিৎ নলকাটায় তার বাড়ির সামনে বন্দুকধারী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী এ মামলায় কোন অভিযোগ আনা হয়নি।

এপ্রিলের ১৬ তারিখে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলায় পুলিশ ২০ জন সাংবাদিককে আহত করেছে। প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিককে আহত করেছে। প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক শামসুল হক টেংকুর উপর পুলিশের পূর্ববর্তী আক্রমণের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রেস বিবরণী

অনুসারে, সাংবাদিকরা মধ্যাহ্ন বিরতির সময় শামসুলের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী পুলিশের নিকট থেকে ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করে। পুলিশ উপ কমিশনার আলি আকবরের নেতৃত্বে সাংবাদিকদের আক্রমণ করে। তাদেরকে ধাওয়া করে ড্রেসিং রুমে নিয়ে যায়। আক্রমণের বেশির ভাগ অংশই ক্যামেরায় ধারণ করা হয় এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচার পায়, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায়। প্রাথমিকভাবে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কিন্তু জনগণের চাপে ১২ই জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর ঘটনার সাথে জড়িত আকবর ও অন্যান্য পুলিশদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যারা ঘটনার শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

মে'র ২৯ তারিখে কুষ্টিয়ায় স্থানীয় সাংবাদিকদের সমর্থনে পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে একটি র‍্যালী করার সময় বিএনপি কর্মীরা ২৫ জনের বেশি সাংবাদিককে আহত করে। মিছিল আহ্বান করা হয় সেই সব সাংবাদিকদের সমর্থনে যাদের বিরুদ্ধে বিএনপির সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম মানহানি মামলা করেছে। মে'র প্রথম দিকে পুলিশ 'আন্দোলনের বাজার' নামক একটি স্থানীয় পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় পত্রিকাটিতে ইসলামের সমালোচনা করা হয় এবং এটি প্রকাশের যথাযথ অনুমতি নেই। ভিডিও ফুটেজ অনুসারে, মে'র ২৯-এ বিএনপি হেড কোয়ার্টারের বাইরে জমায়েত একদল মানুষ র‍্যালী থেকে বের হয়ে রাস্তা অতিক্রম করে লাইব্রেরীর দেয়াল টপকেছে এবং মানুষজনকে লাঠি, চেয়ার এবং ইট দিয়ে পিটিয়েছে। আক্রমণ শুরু হলে পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এতে হস্তক্ষেপ করেনি। আহতদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ও বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেশন ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী। আক্রমণের ধারণকৃত ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ১২ই জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায়, সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম আক্রমণ করার জন্য ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং অন্যান্য সাংবাদিকদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ তুলে নিতে সম্মত হয়, তবে বছরের শেষে মামলাগুলো তুলে নেওয়া হয়নি।

৩০শে মে, পুলিশ সাতক্ষীরায় সাংবাদিকদের উপর কুষ্টিয়ায় যে আক্রমণ হয়েছিল তার প্রতিবাদে সংঘটিত একটি মৌনমিছিল ছত্রভঙ্গ করে। কুষ্টিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে প্রতিবাদকারীরা একটি স্মারকলিপি পেশ করার জন্য ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ঢোকার চেষ্টার করলে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জ করে। তখন পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে সাংবাদিকরা পুনর্মিলিত হয়ে মানববন্ধন তৈরি করে।

প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে অক্টোবরের ৩১ তারিখে, র‍্যাবের সদস্যরা ফোকাস বাংলার সাংবাদিক সফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার ও নির্যাতন করে, তার আটকের অনুকূলে ফৌজদারী আইনের ৬৪ ধারা উল্লেখ করে। সফিকুলকে নির্যাতনের সময় র‍্যাব অন্যায়ভাবে ডেইলি স্টার, সংবাদ ও জনকণ্ঠের সংবাদ কর্মীদের তাদের পরবর্তী শিকার বলে উল্লেখ করে। যখন ইসলামকে একজন বিচারকের সামনে নেওয়া হয় তখন তিনি বলেন যে, একজন র‍্যাব কর্মকর্তা তাকে আট ঘন্টা করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে নির্যাতন করেন। কর্তৃপক্ষ ইসলামকে ইসলামি চরমপন্থীদের সাথে যোগসাজসের অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

নভেম্বরে অন্তবর্তীকালীন সরকার পরিবর্তনের সময় সাংবাদিকদের উপর অত্যাচার চরম আকার ধারণ করেছে। নভেম্বরের ১৩ থেকে ২২ তারিখের মধ্যে ৬ জন সাংবাদিক আক্রমণ ও হুমকির শিকার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নভেম্বরের ১৬ তারিখে ময়মনসিংহের স্থানীয় মিলিশিয়ারা চারজন সাংবাদিক ঃ দৈনিক প্রথম আলোর নাইমুল কবির, দৈনিক জনকণ্ঠের বাবুল হোসাইন, দৈনিক সমকালের মীর গোলাম মোস্তফা এবং নুরুজ্জামান নামে একজন আলোকচিত্রীকে আক্রমণ করেছে এবং গুরুতরভাবে পিটিয়েছে। চারজন সাংবাদিককেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তারা পরবর্তীতে অভিযোগ দায়ের করেছে। কর্তৃপক্ষ ছয়জন আক্রমণকারীকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু নেতা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মুক্ত রয়েছে। এ ছাড়াও নভেম্বরের ২২ তারিখে, ডেইলি স্টার, রেডিও টুডে, এবং রেডিও ডয়েচ ভ্যালে প্রতিবেদক হাসিবুর রহমান বিলু বগুড়ার একটি ব্যাংক ত্যাগ করার সময়ে ছয় সাতজন বাঁশের লাঠিধারী যুবক কর্তৃক প্রহৃত হয়েছে। পা এবং পিঠের আঘাতের কারণে বিলুকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বিএনপির সমর্থকধারী এসব যুবক বিলুকে বিএনপির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

জানুয়ারির ৪ তারিখে, ২০০৪ সালে খুলনার দৈনিক জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালুর হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আদালত নতুনভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। ২০০৫ এর অক্টোবরে খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য শুরু হয়, কিন্তু সরকারি কৌশুলীর বিরুদ্ধে বেঠিক তদন্ত কার্যক্রম ও অপ্রতুল সাক্ষ্য প্রমাণের অভিযোগ আনা হয়। বছর শেষে দু'জন সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নেয়া হয়। চারজন ছিল নিখোঁজ এবং দুইজন ২০০৫ এর অক্টোবর ও ডিসেম্বর র‍্যাব এর ক্রসফায়ারে নিহত হয়। মার্চের ২১ তারিখে, ২০০৪ সালে সাংবাদিক কামাল হোসাইনকে হত্যার দায়ে চট্টগ্রাম দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে একজনকে মৃত্যুদন্ডাদেশ এবং অন্য ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ দেয়। বাকি ১৪ জন অভিযোগ থেকে খালাস পায়।

সাংবাদিক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ২০০৭ এর জানুযারীতে শুরু হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০০৫ এ ঢাকার একটি আদালত চৌধুরীকে জামিন মঞ্জুর করে অব্যাহতি দেয়। তাকে ২০০৩ এ রাষ্ট্রদ্রোহ ও ইসরাইল ভ্রমণের চেষ্টার অভিযোগে বিমান বন্দরে আটক করা হয়।

২০০৪ এর খুলনা প্রেসক্লাব সভাপতি মানিক চন্দ্র সাহার হত্যাকান্ড বা ২০০৪ এর দৈনিক দুর্জয় বাংলার সম্পাদক দিপঙ্কর চক্রবর্তীর হত্যাকান্ড মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি।

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়েই গণমাধ্যম প্রবেশে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা উভয়েই কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সভায় বিশেষ কিছু টেলিভিশন স্টেশনের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছিল।

সরকার অক্টোবরের ১০ এ ভারতীয় পাক্ষিক ম্যাগাজিনের দেশ এর অক্টোবরের ২ সংখ্যা আমদানি, বিক্রয় এবং পুনঃ প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল।

প্রথম আলো পত্রিকায় জাতীয় পার্টির নেতা এবং সাবেক সভাপতি এইচ. এম. এরশাদ কর ফাঁকি দিয়েছে বলে একটি সংবাদ ছাপানো হলে জুলাই ২২ এ জাতীয় পার্টির কর্মীরা দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার

কপি আটক ও ধ্বংস করে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জাতীয় পার্টি সমর্থকরা মাগুরার একটি প্রধান সড়ক অবরোধ করে এবং একটি বাস থেকে ১১,০০০ কপি পত্রিকা ছিনিয়ে নেয়। বাস কোম্পানির পরিদর্শক সাগর গাজী, জাতীয় পার্টির জেলা ইউনিট সাধারণ সম্পাদক হাসান সিরাজ মুজা এবং আরো ৭০ জনকে অভিযুক্ত করে মাগুরা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলার অবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিদেশি প্রকাশনা এবং চলচ্চিত্র পুনর্মূল্যায়ণ ও সেন্সর সাপেক্ষ। সরকার পরিচালিত একটি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র পুনর্মূল্যায়ণ করে এবং দেশের নিরাপত্তা, আইন এবং শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশ্লীলতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অবমাননা বা অন্যের রচনা বা ভাব চুরির অপরাধে চলচ্চিত্রের নিন্দা বা নিষিদ্ধ করার কর্তৃত্ব রাখে। ভিডিও ভাড়া প্রদানকারী পাঠাগার ও ভিসিডির দোকানগুলো বিভিন্ন রকমের চলচ্চিত্র মজুত রাখত এবং ভাড়ার উপর সরকারের অনুমোদনকরণ প্রচেষ্টা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অকার্যকর।

এ বছর সময়কালে সরকার সেন্সরশিপ আইন শক্তভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করে। সেপ্টেম্বরে সরকার একটি আইন পাস করেছে সেটি সরকারকে জনস্বার্থে কোন প্রাইভেট স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই আইন সরকারকে যে সকল স্টেশন অরুচিশীল চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান প্রচার করে সেগুলো বন্ধ করার এবং বিদেশি পণ্য বিক্রয় প্রতিরোধের অনুমতি প্রদান করে। এছাড়া সরকার চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন সংশোধন করেছে, তাতে সেন্সর সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে চলচ্চিত্র, পোস্টার ও বিজ্ঞাপন প্রচার করার ক্ষেত্রে শাস্তি বৃদ্ধি করেছে। মার্চে তথ্য মন্ত্রণালয় সিনেমা হলে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা নিষিদ্ধকরণের প্রচেষ্টা তীব্রতর করার আদেশ দিয়েছে।

সরকার টেলিভিশন লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের লাইসেন্স মঞ্জুর করেছে কদাচিৎ।

সরকার বেশিরভাগ সময় দুর্বিনীত বা অশ্লীল ছবি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিকৃতি, ইসলাম ধর্মের অবমাননা অথবা জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মুসলিম বিশ্বাসের প্রতি অবমাননা করার ফৌজদারী অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালে মুচলেকা দিয়ে মুক্ত হওয়ার পর তসলিমা নাসরিন দেশের বাইরে কলকাতায় অবস্থান করছেন।

আহমদিয়া প্রকাশনার উপর ২০০৪ এর নিষেধাজ্ঞা পুনর্মূল্যায়ণ বিষয় হাইকোর্টে বছর শেষে মুলতবি আছে।

সরকারি ব্যক্তিত্বরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য ঘন ঘন মানহানির অভিযোগ করে। উদাহরণস্বরূপ ২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটি মানহানি মামলা করেছে। সম্পাদক পত্রিকায় মির্জা আব্বাসকে রাজার বাগে পুলিশ কমপ্লেক্স নির্মাণের বিরোধিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে সংবাদ ছাপালে আব্বাস মামলাটি দায়ের করে। প্রকাশক আব্বাসকে সংবাদটির বিপরীতে কোন প্রতিবেদন ছাপানো অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে।

এপ্রিল ২ এ সংসদের চিফ হুইফ বিএনপির খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, সংবাদ, যুগান্তর এবং আজকের কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছে কারণ এই সংবাদপত্রগুলো তাকে ব্যক্তিগত লাভে বিনোদন ভাতা এবং সংসদীয় সম্পদ অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ সম্পাদক এবং কর্মীদের জামিনে মুক্তি দিয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট শেষ পর্যন্ত অভিযোগগুলো বাতিল করে দেয়। কিন্তু হোসাইন একটি আপিল আবেদন দায়ের করেছে যা বছরের শেষে অমীমাংসিত রয়েছে।

জুনে বিএনপির এমপি আবদুল মান্নান দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক, প্রকাশক এবং অন্যান্য কর্মীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করেছে। মান্নান পত্রিকার কর্মীদের মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে কারণ তারা ৩১ মে'তে তাকে হেরোইন চোরাচালানের সাথে জড়িয়ে একটি সংবাদ ছেপেছে।

**ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা ঃ**

ইন্টারনেটে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন সরকারি বাধা নেই। ব্যক্তি ও দল ই-মেইলসহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে অভিমত প্রকাশে নিয়োজিত হতে পারে। RSF অনুসারে পুলিশ প্রায়ই অবৈধভাবে সাংবাদিকদের ই-মেইলের উপর নজরদারি করত।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাধা দেয় না, তবে কর্তৃপক্ষ স্পর্শকাতর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা নিরুৎসাহিত করে।

**শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ**

জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত না হওয়ার সাপেক্ষে আইন সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে সরকার ঘন ঘন এইসব অধিকারকে খর্ব করে।

**সমাবেশের স্বাধীনতা ঃ**

এই আইন সরকারকে চারজনের বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা অনুমোদন করে এবং একটি স্থানীয় বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা এআইএন ও সালিশ কেন্দ্র অনুসারে সরকার নিরাপত্তার স্বার্থে এ বছর ১৬৪ বার র‍্যালি নিষিদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও সরকার প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদ কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার জন্য গণগ্রেপ্তার চালিয়েছে।

এ বছর পুলিশ ও বিরোধী দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধীদল সরকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান অবরোধ এবং শহরের পরিবহন যোগাযোগ এবং চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেয়ার কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত এবং এটা হরতাল বলবৎ করেছে। এই প্রতিবাদের সময় পুলিশ ও প্রতিবাদকারীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়েছে, যার ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে।

**সংগঠন করার স্বাধীনতা ঃ**

নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার জননিরাপত্তা স্বার্থে কিছু "যুক্তিসংগত বাধ্যবাধকতার" আওতায় আইনে প্রত্যেক নাগরিককে সংগঠন করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সরকারও এই অধিকারকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে। প্রত্যেক নাগরিককে তার পছন্দ মতো দলে যোগদান করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

**গ) ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ**

রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং আইন, জনশৃঙ্খলা / জননিরাপত্তা ও নৈতিকতা বজায় রাখার চুক্তিতে প্রত্যেককে তার ইচ্ছে অনুযায়ী ধর্মীয় কার্যাবলী পালনের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। সরকার ও এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সরকার ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী হলেও রাজনীতি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। সরকারি ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র যেমন ঃ সরকারি চাকুরী, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সুবিচার প্রাপ্তি প্রভৃতিতে এই সম্প্রদায় সুবিধাবঞ্চিত হয়।

রাষ্ট্রীয়ভাবে শরিয়া (মুসলিম আইন) কার্যকর ছিল না এবং অমুসলিমদের উপর এই আইন চাপিয়েও দেয়া হত না কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিচার সংক্রান্ত কাজে এটা প্রভাব বিস্তার করত।

**বিবাহ, তালাক এবং দত্তক সংক্রান্ত।**

পারিবারিক আইনসমূহে খুব সামান্যই পার্থক্য ছিল এবং তা নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়ের উপর। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব পারিবারিক আইন রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উত্তরাধিকার বিবাহ এবং নিবন্ধিত বিবাহিতদের তালাক সংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ সনাতন মুসলিম আইনেরই কিছুটা পরিবর্তন করে জারী করা হয়েছে। একজন মুসলমান পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার রাখে কিন্তু তাকে অবশ্যই দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করার পূর্বে প্রথম স্ত্রীর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

হিন্দু আইনে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে তবে তালাক বা পৃথকভাবে বাস করার ব্যাপারে কোন বিধান নেই। হিন্দু বিধবাদের আবার বিবাহ করার অধিকার আছে। যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী সদস্যকে বিবাহ করার উপর হিন্দু ধর্মে আইনতঃ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পল্লী অঞ্চলের বিবাহ সমূহ প্রায়শঃই নিবন্ধন করা হয় না।

ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে সাধারণতঃ সরকারীভাবে নিবন্ধন করার উপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু এই সংগঠনগুলিকেও এন.জি.ওদের সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হয়। কোন এন.জি.ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করার পরিকল্পনা করলে অতিরিক্তভাবে তাদের অবশ্যই এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরোতে ও অধিভুক্ত হতে হয়। সরকারের যে কোন এনজিওর নিবন্ধন বাতিলসহ অন্য যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। যেমন ঃ এনজিওর কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে দেয়া, ব্যাংক হিসাব বন্ধ করা। অথবা তাদের প্রজেক্ট বাতিল করা। যদিও সরকার খুব কমই এ ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

সরকার আহমেদিয়াদের উত্থানকে নিরাপত্তা দিয়েছে যদিও বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত থাকে। সরকার আহমেদিয়াদের সাহিত্য সংকলন প্রচারের উপর হাইকোর্টের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারী করে (সেকশন ২.এ)।

১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় হিন্দুদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক দখলকৃত সম্পত্তি সমূহের হিসাব তৈরি করতে অতীত থেকেই সরকার ব্যর্থ।

বিদেশি ধর্মীয় সংস্থাসমূহকে এদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু তাদের ধর্মান্তর গ্রহণের অধিকারকে আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে রক্ষা করা হয়নি। ধর্মীয় সংস্থাসমূহ ভিসা পাওয়া কিংবা বছরে একবার নবায়নযোগ্য ভিসা নবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু বিদেশি ধর্মীয় সংস্থার বরাতে জানা যায় যে, স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাদের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যদিও এ বছরে সরকার কর্তৃক তারা নির্যাতিত হয়েছে এ ধরণের কোন রিপোর্ট নেই। সরকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্চনা করা, যাজকদের শিক্ষাদান করা, ধর্মীয় কাজে ভ্রমণ করা এবং বিদেশে সমধর্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার অধিকার দিয়েছে। নাগরিকগণকে ধর্মান্তর গ্রহণ করার অধিকার ও দেয়া হয়েছে।

**সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্য ঃ**

আহমেদীয়ান, হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ সারা বছর ধরেই বৈষম্যের শিকার হয়।

২৩ জুন আহমেদিয়া বিরোধী সংগঠন 'খতমে নবুয়ত সংস্থা বাংলাদেশ' (IKNMB) এর কমপক্ষে ১,৫০০ জন সদস্য উত্তরার আসকোনা আহমেদিয়া মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার জন্য আন্দোলন করে। সরকার ৩০০ পুলিশ নিয়োগ করে আহমেদিয়া কমপ্লেক্স ঘিরে রেখে সহিংসতা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যর্থ হয়ে আন্দোলনকারীরা উত্তরা এলাকা ত্যাগ করে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের প্রধান প্রবেশ সড়ক বন্ধ করে দেয়। পুলিশ এদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এই ঘটনায় ২০ জন আহত হয়। তথ্য মাধ্যমগুলির রিপোর্টে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বরে হিন্দুদের বাৎসরিক উৎস দুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্বে কক্সবাজার; নীলফামারী, মৌলভীবাজার এবং টাঙ্গাইলসহ দেশের কয়েকটি স্থানে হিন্দুদের দেবী দূর্গার প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

৬ অক্টোবর আহমেদিয়া বিরোধী আন্দোলনকারীরা (IKNMB) নাখালপাড়ার আহমেদিয়া মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। পুলিশ বড় ধরনের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই বিক্ষোভকারীদের মসজিদের কাছে আসতে না দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

২০০৫ সালের জুনে সংঘটিত নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বাদুগড়ে আহমেদিয়া মসজিদে আগুন লাগানো ও বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে এই বছরে পুলিশ ৮ জনকে আটক করে।

খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার সম্পর্কিত ছবি প্রদর্শনের অপরাধে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশি এন.জি.ওর দুইজন খ্রীষ্টান কর্মচারী নিহত হয়। এই হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রাথমিক অবস্থায় পুলিশ সন্দেহভাজন কিছু লোককে আটক করলেও পরে তাদের মুক্তি দেয়া হয় এবং বছরের শেষ পর্যন্ত এই কেসের বিরুদ্ধে কোন প্রকার চার্জ গঠন করা হয়নি।

২০০৪ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সংগঠিত সহিংস ঘটনার বিপরীতে কোন সঠিক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। স্থানীয় একজন বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ২০টি হিন্দু বাড়ীতে আগুন দেয়। এতে ৩০ ব্যক্তি আহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বরাতে জানা যায় যে, পুরাতন সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদের জের হিসাবে এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল।

জামালপুর জেলার ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান জোসেফ গোমেজ ২০০৪ সালে তার বাড়ির কাছাকাছি খুন হয়। এই মামলা তদন্তের ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। মাওলানা আব্দুস সোবহান মুন্সী নামক ঐ এলাকার একজন মাদ্রাসার শিক্ষককে পুলিশ দুই সপ্তাহ আটক রেখে পরে মুক্তি দেয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাজনীতি এবং সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারি চাকুরীর বাছাই কমিটিগুলিতেও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অপ্রতুল। জানামতে এখানে কোন ইহুদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পত্রিকায় উক্ত জাতিবিরোধী প্রতিবেদন / মন্তব্য প্রকাশ পায়। আরো তথ্যের জন্য ২০০৬ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট দেখুন।

**ঘ) আন্দোলন করার স্বাধীনতা বিদেশ ভ্রমণ, অন্যদেশে বাস করা এবং স্বদেশে পুনর্বাসিত হওয়াঃ**

আইনের মাধ্যমে এই অধিকারগুলির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সরকার এই আইনগুলির প্রতি সাধারণত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তারপর ও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে সরকার এই অধিকার সমূহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

প্রায়শই বিরোধী দল রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবহন অবরোধ হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। প্রতিবাদের এই ধরনের আইন বহির্ভূত পদ্ধতিগুলির সিদ্ধান্ত সাধারণত দলের নেতাদের দ্বারা গৃহীত হয় আর তা সহিংস আকারে জনগণের চলাচলের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

যেমন ঃ জুলাই ২, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল দেশব্যাপী পরিবহন অবরোধের ডাক দেয়। সমর্থকরা বেশিরভাগ সড়ক ও রেলপথসমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও রেললাইন উপরে ফেলে এবং সমস্ত দেশে চলন্ত ট্রেনে আক্রমণ চালায়।

২০ সেপ্টেম্বর বিরোধী দল আবার বড় বড় শহরে সকাল সন্ধ্যা পরিবহন অবরোধের কর্মসূচী পালন করে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে। Odhikar এর তথ্যানুযায়ী মধ্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতায় ২৩ জন নিহত ও ১৫২২ জন আহত হয়েছে। অক্টোবরের শেষের দিকে বিএনপি সরকারের ক্ষমতার মেয়াদের শেষ মুহুর্তে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক লাগাতার সহিংস আন্দোলন পরিচালিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান কে ক্ষমতা গ্রহণ না করতে দিবার দাবীতে। শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দলীয় সমর্থকদের তাদের দলীয় প্রতীক লগি, বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার ঘোষণা দেয়। ২৭শে অক্টোবর থেকে ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে প্রচন্ড সহিংস সংঘর্ষ চলতে থাকে, যার ফলে ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২৯শে অক্টোবর বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে অস্বীকৃতি জানালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নভেম্বরে ১৪ দলীয় জোট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনের তারিখের প্রতিবাদে দেশব্যাপী পরিবহন অবরোধের ডাক দেয়।

সমস্ত ডিসেম্বর মাস ধরে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলোর ডাকে পরিবহন অবরোধ, ধর্মঘট, সরকারি অফিসসমূহ, যেমন ঃ প্রেসিডেন্টের অফিস, অবরোধসহ নানা ধরনের বিক্ষুব্ধ কর্মসূচী চলতে থাকে।

১৮ই ডিসেম্বর বিরোধী জোট আরো দুটো দলকে অন্তর্ভুক্ত করে মহাজোট গঠন করে। ২৩ ডিসেম্বর মহাজোট তাদের পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী বাতিল করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ও সময় সময় বিরোধী দলগুলির নানা ধরনের সহিংস কর্মসূচীতে জনজীবন বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং তা চলেছে সমস্ত বছর ধরেই। কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা জোটগতভাবে ঘোষিত প্রতিবন্ধকতামূলক কর্মসূচিগুলিতে শুধুমাত্র জরুরী এবং নির্বাচিত কিছু যানবাহন রাস্তায় চলাচল করতে পেরেছে। বাস ও গাড়িগুলিকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে পুড়িয়ে দেয়া হত। বেশিরভাগ দোকান, ব্যাংক, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজ নিরাপত্তার খাতিরে বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হত। (দেখুন সেকশন ২.বি)

আইন নির্বাসনকে উৎসাহিত করে না এবং তা ব্যবহারও করা হয় নাই। দেশিয় পাসপোর্টধারীদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল।

(ইউএনএইচসিআর) যেসব ব্যক্তিকে ইউএনএইচসিআর শরণার্থী হিসেবে সনাক্ত করেছে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে তাদেরকেই কেবল সরকার সাময়িক সহায়তা প্রদান করেছে।

ওই বছর সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য বার্মার দেয়া কোনো সহায়তা গ্রহণ করেনি। এই শরণার্থীদের সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখছে এবং যাদেরকে সম্ভব হচ্ছে সীমানাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। ইউএনএইচসিআর এর সূত্র থেকে জানা যায়, কিছু শরণার্থী, যাদেরকে সরকার ফিরিয়ে এনেছে, তারা শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার ইউএনএইচসিআর ক্যাম্পে যাদের নিবন্ধন নেই এবং বার্মায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল, এমন অনেককে অবৈধভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যারা তাদের আত্মীয়দের সাথে বাস করছে এবং নিবন্ধিত সদস্যদের মতই ক্যাম্প থেকে রেশন গ্রহণ করছে। বেশ কয়েকবার ক্যাম্পের কর্মকর্তারা অনিবন্ধিত কয়েকজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে, যাদেরকে বিদেশি অধ্যাদেশের আওতায় আটক দেখানো হয়েছে। বছর শেষে কক্সবাজার অঞ্চলের কারাগারগুলোয় মোট ৭১ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর সন্ধান পাওয়া যায়। এদের ভেতর ৫ জন সাজাপ্রাপ্ত এবং বাকি ৬৬ জন বিচারাধীন। এছাড়া কুমিল্লার কারাগারে দুজন ও চট্টগ্রামের কারাগারে দুজন রয়েছে। সম্প্রতি আরও দুজন অনিবন্ধিত বর্মি সাজাপ্রাপ্ত হিসেবে জেল খাটছে এবং ২৬১ জন বিচারাধীন রয়েছে।

সরকারি সূত্র থেকে জানা যায়, ইউএনএইচসিআর এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত সরকারি দুই ক্যাম্পে মোট ২১,৩২২ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। তবে ইউএনএইচসিআর এর ধারণা, এ সংখ্যা ২৮,০০০ এর মত হবে। যেসব আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগঠন ওই অঞ্চলে কাজ করছে তাদের হিসেব অনুযায়ী, টেকনাফ এবং কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় ২০০,০০০ রোহিঙ্গা বাস করছে যাদেরকে শরণার্থী হিসেবে

চিহ্নিত করা হয়নি এবং বার্মায় কোন রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো হয়নি। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছিল। বছরের শেষ দিকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং কক্সবাজারের নিকটবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলোর অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হয়। সরকারের নতুন প্রতিনিধি আসায় ইউএনএইচসিআর ও সরকার শিবিরগুলোর উন্নতিকল্পে একমত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেসব আবাসন দুর্বল হয়ে ভূমিতে পড়ে যাচ্ছিল, সেগুলো মেরামতের জন্য একটি পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ। পায়খানা নির্মাণেরও একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সম্মত হয় এবং শিবিরগুলোর উন্নয়নকল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওদের আবার কাজ করার অনুমতি দেয়।

ইউএনএইচসিআর এর সূত্রমতে, শরণার্থী নিপীড়নের অনেক ঘটনা যেমন ধর্ষণ, লাঞ্ছিতকরণ, পারিবারিক নিপীড়ন, রেশন থেকে বঞ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না দেয়া উল্লেখযোগ্য।

এক পুলিশ ইন্সপেক্টর ও তার সহকর্মীরা ২০০৫ সালের মার্চে ৬ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে, যাদের মধ্যে একজন আট বছরের ও একজন ১২ বছরের শিশুও রয়েছে। ইউএনএইচসিআর এই মর্মে একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করে। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ইউএনএইচসিআর শিবির কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সরকার ভ্রুক্ষেপ করেনি।

রিফুজি ইন্টারন্যাশনালের সূত্রমতে, সরকার বিশেষ করে কক্সবাজারের সাবেক স্থানীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার শোয়েবুর রহমান শরণার্থীদের চলাফেলা ও কাজকর্মের ওপর বাড়তি কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। এছাড়া শোয়েবুর রহমান ইউএনএইচসিআর এর কার্যক্রমে এবং কোন কোন এনজিওকে শিবিরের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে বাধা দেন। আগস্টে তার দায়িত্ব শেষ হলে সরকার মিডিয়ায় যেসব বিষয় বেশি আলোচিত হয়েছে সেসব বিষয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

যেসব রোহিঙ্গা শরণার্থী বার্মায় ফিরে যেতে পারছে না তারা যাতে এখানে কাজ করতে পারে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ পায় ইউএনএইচসিআর এর এই অনুরোধ সরকার বরাবরের মতই অবজ্ঞা করে। সরকার তার আগের মতেই অটুট থাকে, সমস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বার্মায় ফিরে যাবার আগ পর্যন্ত শিবিরে অবস্থান করতে হবে এবং তারা নিজেদের কাছে কোনো টাকা রাখতে পারবে না, যদি রাখে তাহলে তা যে কোনো সময় বাজেয়াপ্ত করা হবে। বরাবরের মতই সরকার ইউএনএইচসিআর এর সেল্ফ রিলায়েন্স প্রোগ্রামের আওতায় শরণার্থীদের সাময়িক অবস্থান ও চলাফেরার স্বাধীনতা বিষয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

প্রায় ৩০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বাস করছে যারা ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়। রিফুজি ইন্টারন্যাশনালের সূত্রমতে, এরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে এবং খুব অল্পই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়ে থাকে। অনেক বিহারী ১৯৭২ সালে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেনি, এবং পাকিস্তানে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে, যেখানে পাকিস্তান সরকার তাদেরকে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করছে।

এদের অনেকেই আবার ১৯৭১ এর পরে জন্মগ্রহণ করেছে যারা মূলধারার বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে মিশে গেছে।

**সেকশন ৩ ঃ রাজনৈতিক অধিকার ঃ সরকার পরিবর্তনে নাগরিকের অধিকার ঃ**

আইন নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার প্রদান করে। নাগরিকরা নির্দিষ্ট মেয়াদে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে ভোট দিয়ে এই অধিকার প্রয়োগ করে; আন্তর্জাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর পর পর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। সংসদে ৩৪৫ জন সদস্য রয়েছেন, যাদের ৩০০ জনই নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাকি ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত যারা রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা মনোনীত এবং নির্বাচিত সদস্যের আনুপাতিক হারে দলগুলো এই মনোনয়নের সুযোগ পায়। দলের নেতৃবর্গ নির্বাচনে প্রার্থী নির্ধারণ করেন; কোনো কোনো প্রার্থী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কর্মকান্ডের বিনিময়ে আবার কেউবা ব্যক্তিগত উপহারের বিনিময়ে মনোনয়ন ক্রয় করেন।

**নির্বাচন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ**

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হন, আন্তর্জাতিক ও দেশিয় পর্যবেক্ষকদের মতে এই নির্বাচন ছিল সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ। ২০০১ সালের নির্বাচন এক ত্রাস ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি জামায়াতে ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। তবে রাজনীতির মাঠে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রধান ভূমিকায় থাকে।

পুরো বছর জুড়ে আওয়ামী লীগের আইন প্রণেতারা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও উপনির্বাচন বর্জন এবং প্রায়শঃই সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। এক বছর বর্জনের পর ২০০৪ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগ সংসদে ফিরে আসে, এবং স্পীকার সরকারী দলের কথাই শুনছেন এই কারণ দেখিয়ে ২০০৪ এর সেপ্টেম্বরে আবার ওয়াকআউট করে। আওয়ামী লীগ সদস্যরা জানুয়ারি ২৭ তারিখে নিহত সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদ জানাতে ফেব্রুয়ারি সংসদীয় অধিবেশনে কয়েক মিনিটের জন্য উপস্থিত হন (সেকশন ১.ক দেখুন)। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ এমনকি সংগঠিত হতে না দেয়া ও নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপের বিরোধিতা করে (সেকশন ২.খ দেখুন)।

২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে মোট সাতজন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসেন। ২০০৪ সালের মে মাসে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের জন্য যে ৪৫টি আসন বরাদ্দ করা হয়, সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দলগুলো সেসব আসনে মনোনয়ন দেয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ৪৫টি আসন বরাদ্দের বিতর্কে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের প্রাপ্য আসনে মনোনয়ন দান থেকে বিরত থাকে এই মর্মে যে, এই সংশোধনী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, কারণ, এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অনেক নারী অধিকার সংগঠন একই কারণে এই সংশোধনীর বিরোধীতা করে হাইকোর্টে এর বৈধতার চ্যালেঞ্জ করে। সুপ্রীম কোর্ট রীটটি খারিজ করে দেয়। অক্টোবরে সংসদে মন্ত্রীর মর্যাদায় ছিলেন মোট দুইজন নারী সদস্য। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী। শেষ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা বহন করতেন। সুপ্রীম কোর্টের ৭৬

জন বিচারকের ভেতর ৪ জন ছিলেন নারী। সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে কোন আসন বরাদ্দ নেই। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৩ শতাংশ।

**সরকারের দুর্নীতি ও স্বচ্ছতা ঃ**

সরকারের সর্বস্তরে দুর্নীতি একটি সমস্যা হিসেবেই থেকে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জুলাই এর এক প্রতিবেদনে সর্বস্তরে দুর্নীতিকে সুশাসনে প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে। টিআইবি ৩৮টি খাতের ভেতর ১০টিকে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে নির্দেশ করে। ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে আর্থিক অসংগতি পাওয়া যায় যা মোট ৭৯০ কোটি টাকারও বেশি। আর্থিক অসংগতির ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সবার শীর্ষে অবস্থান করে। দুইটি জেলায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার ওপর এক জরিপে দেখা যায়, ৬৩ শতাংশ ছাত্রদেরকে সরকারি শিক্ষা বৃত্তি তোলার জন্য ঘুষ প্রদান করতে হয়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক ২১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার অবৈধ ফি আদায়। দু'টি প্রধান স্থল বন্দরে আমদানী-রফতানীকারকদের ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ঘুষ প্রদানের ঘটনাটি টিআইবির দু'বছরের গবেষণা যা এপ্রিলে প্রকাশিত হয়।

২০০৪ সালে স্থাপিত তিন সদস্যের দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের প্রভাব দূর্নীতি দমনে অল্প প্রভাব বিস্তার করে এবং বিগত দু'বছরে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলোই আলোচনায় বেশি এসেছে।

সরকারের তথ্য জানার অধিকার সম্বলিত আইনের অনুপস্থিতি ছিল। ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয় আইন জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ধারা ৪ মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি তদন্ত সম্পর্কে সরকারের মনোভাব

দেশি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো যৌথ স্বাধীনভাবে এবং সরকারের বিনা বাধায় মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো নিয়ে তাদের তদন্ত ও তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। যেহেতু মানবাধিকার সংগঠনগুলো সরকারের দৃষ্টিতে ভয়ানকভাবে নাজুক তাই তারা স্ব-প্রেষণায় রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর মামলা ও বিষয়গুলো বিবাচন (censor) করে।

বিগত বছরগুলোর মত এবারও সরকার কোন মানবাধিকার সংগঠনের উপর চাপ প্রয়োগ করেনি এবং তাদের উপর কোন মিথ্যা মামলা যেমন রুজু করেনি তেমনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীর রি এন্ট্রি ভিসা প্রদানে বিলম্ব করেনি। কিছু স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো অবশ্য বলেছে, তারা বিশ্বাস করে সরকার তাদের টেলিফোনে আড়িপাতে এবং ই-মেইল অ্যাকাউন্টগুলো তদন্ত করে।

গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক হয়রানির যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, PRIP এনজিও'র ফান্ড প্রাপ্তিতে সরকার হুমকি প্রদান করে, যদি না সংখ্যালঘুর উপর মানবাধিকার কার্যক্রম নিয়ে কর্মরত সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের পরিবর্তনে ঐকমত্য না হয়।

মধ্য সেপ্টেম্বর এনজিও'প্রশিকার ১৭২ জন কর্মীকে পুলিশ আটক করে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায়, সরকার বিশ্বাস করে প্রশিকার কর্মীরা বিরোধী দলের প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নিবে। (দেখুন ধারা ১. গ)

৯ই জুলাইতে টিআইবি, স্থানীয় অফিস যখন তার বার্ষিক প্রতিবেদনে 'দুর্নীতির আলোকে' সূচক এবং দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে পঞ্চম বছরের মত স্থান দেয় তখন সরকার কড়া ভাষায় তার সমালোচনা করে। বেশ ক'জন মন্ত্রী টিআই'র স্থানীয় প্রতিনিধিকে দুর্নীতি অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের বিভিন্ন সময় সরকার সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) কে অভিযুক্ত করে। বিরোধটা বাধে যখন সংস্থার আন্তর্জাতিক সহযোগী ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম (ডব্লিউএএফ) দেশে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে।

বছরের শেষে, ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও স্বাপনাতে আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সম্পৃক্ততা নিয়ে বিচার চলে। কর্তৃপক্ষ ২০০৫ সালে আহলে হাদিস, একটি স্থানীয় ইসলামী গ্রুপের নেতা আসাদুল্লা গালিবকে গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাক অফিসসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবে বোমা হামলার জন্য দায়ী করে। সরকার ইউএনএইচসিআর ও আইসি আর সি'র মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা করে, কিন্তু আইসি আর সি'র কেউই ও বছর দেশে আসেননি। ডিসেম্বর ২০০৪, ইউএনএইচসিআরের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রোহিঙ্গাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। সরকারের নির্বাচন ওয়াদা এবং বহুবার জনসমক্ষে ঘোষিত একটি স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের কথা থাকলেও সরকার আইনগতভাবে ঐ কাজে কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। অতীতের প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার ন্যায়পালই মুখ্য ভূমিকায় রয়ে যায়।

**ধারা ৫ বৈষম্য, সামাজিক নিপীড়ন এবং মানুষ পাচারঃ**

বাংলাদেশের আইন কোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে, কিন্তু সরকার বৈষম্য দূরীকরণে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মহিলা, শিশু, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কদাচিৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে রেহাই পেয়েছে।

**মহিলাঃ**

আইন মহিলাদের উপর যে কোন প্রকার বৈষম্যের বিরোধিতা করে এবং কেউ যদি নারী ও শিশুদের উপর নিপীড়ন করে থাকে, তবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে কঠোর দন্ড, নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা এবং ঐ মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তার কর্তব্য অবহেলা অথবা ইচ্ছাকৃত ঔদাসিন্য অথবা কতর্ব্য অবহেলা দেখা গেলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা থাকলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বল ভূমিকা পালন করে।

২০০৩ সালে সংসদ চলতি আইনের সংশোধনী আনে, যৌতুকের মত অপরাধে বিদ্যমান দুর্বল আইনী বিধান এবং অসম্মানজক আচরণের কারণে যে মহিলা আত্মহত্যা করল সেই অসম্মানকারীর বিরুদ্ধে বিদ্যমান

আইন দুর্বলতা সংশোধনের মধ্যে রয়েছে। ৩রা অক্টোবর সংসদ মহিলা অপরাধীদের প্যারোলে মুক্তি দেয়ার আইন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সাজাপ্রাপ্ত মহিলার জেলে থেকে মুক্তির বিধান পাস করে। (দেখুন ১.গ)

**পারিবারিক ঃ**

নির্যাতন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। যদিও মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের সংখ্যা নিরুপন দুসাধ্য ব্যাপার, সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা নিদেনপক্ষে একবার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যৌতুক নিয়ে বিরোধের কারণেই পারিবারিক নির্যাতন হয়েছেন। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অধিকার ১৪৩টি যৌতুকের কারণে হত্যার ঘটনা নথীভুক্ত করেছে।

আইনে স্বামী কর্তৃক দৈহিক নির্যাতন ও ধর্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও স্বামীর ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট বিধান রাখেনি। একটি স্থানীয় এনজিও থেকে জানা যায়, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, তাদের মধ্যে ১২৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৩ জন ধর্ষিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছে। হিউম্যান রাইটস মনিটরস জানায় প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী; সামাজিক কারণে ধর্ষিতার বিষয়টি আর কাউকে জানায় না। ধর্ষণকারীদের শাস্তি অসম। বিএসইএইচআর (BSEHR) আয়োজিত এক কর্মশালায় (জানুয়ারি ২০০৫) তৎকালীন অ্যাটনী জেনারেল এ. এফ হাসান আরিফ জানান, "বিচারক ধর্ষণ মামলাগুলোকে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধের মত গুরুত্ব দেয়।"

২৯ জানুয়ারি, ঢাকার একটি আদালত ২০০২ সালের জানুয়ারিতে ১৫ বছর বয়সী এক গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণের দায়ে বেলাল হোসাইন ও শাহআলমকে ৩০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এপ্রিলে ট্রাফিক পুলিশ কনস্টবেল আজাদুল ইসলাম ১২ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি ইসলামপুরের এক ব্যবসায়ীর বাসায় কাজ করতো এবং নির্যাতনের কারণে সে পালিয়ে যায়। যখন আজাদুল ইসলাম মেয়েটিকে পায়, তখন সে তাকে তার পূর্ব বাসাবোর ভাড়া বাড়িতে থাকতে বলে। ১৫ই এপ্রিল ইসলাম পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী তাকে উদ্ধার করে নিশ্চিত হন, তাকে বেশ ক'বার ধর্ষণ করা হয়। প্রতিবেশী সবুজবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন। ইসলামকে চাকুরিচ্যুত করা হয়, কিন্তু ২২শে জুলাই এর আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করা হয়নি, ইতোমধ্যে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পতিতাবৃত্তিকে বৈধ রাখা হয় এবং এটি সারা বছরে সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করে। ১৮ বছর না হলে পতিতাবৃত্তি করা যায় না, বিষয়টি কর্তৃপক্ষ প্রায়শঃ উপেক্ষা করে, বয়সের সনদে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়। অল্প বয়সীদের কদাচ বিচারের মুখোমুখি করা হয় এবং বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বয়স্কদেরকে পতিতালয়ে কাজ করতে দেখা যায়। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ২০০৪ সালের এক পরিসংখ্যানে বলে ১০,০০০ অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা দেশ জুড়ে পরিচালিত বাণিজ্যিক যৌন হয়রানি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য আরেকটি রিপোর্ট এ সংখ্যাকে অপর্যাপ্ত বলেছে, তাদের মতে ২৯,০০০ জনের পরিসংখ্যান উপস্থিত করে (দেখুন ধারা-৫, শিশু)। দেশের এবং দেশের বাইরে নারী পাচার একটি সমস্যা হিসেবেই থেকে যায়। (দেখুন, নারী পাচার, ধারা-৫)

সরকারি তথ্য মতে, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে দুস্থ মানুষের জন্য ৬টি ভবঘুরে কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে। এই কেন্দ্রগুলোতে ২,৩০০ জনের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের জন্য ৬টি কেন্দ্র পরিচালনা করে। প্রতিটি বিভাগে একটি।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, একটি এনজিও দুঃস্থ পুরুষ ও অভাবী নারীও শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে। BSEHR এর মতে, যাকে নিরাপদ আশ্রমে নেওয়ার কথা, তাকে কোনভাবেই কারাগারে পাঠানো হয়নি। আদালত তাদের অধিকাংশকে আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অন্যত্র পাঠানোর জন্য স্বল্পসময় তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়। ইসলামী রীতি অনুযায়ী কেবল ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ মুফতিরাই ফতোয়া দেয়ার জন্য কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। কিন্তু গ্রামের ধর্মীয় নেতারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে এবং ফতোয়া পেশ করে। মাঝে মাঝে আইন বহির্ভূত সাজা, বিশেষত মহিলাদের বিরুদ্ধে, তারা তাদের স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে হয়ে থাকে।

গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের বিরুদ্ধে ফতোয়ার ব্যাপারগুলো ধর্মীয় নেতা কর্তৃক দেখভাল হয়ে থাকে। (দেখুন ধারা ১.গ)। এসিড নিক্ষেপ একটি সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। উল্লেখযোগ্য, সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাদের উপর এসিড ছুড়ার কারণে তাদের মুখমন্ডল বিকৃত অন্ধ হয়ে যায়। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, অধিকারের প্রতিবেদন মতে ১৬১ জন এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়। তাদের ১০৫ জন হলো মহিলা, ৩৬ জন পুরুষ এবং ২০ জন শিশু। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩৬ জনকে সাজা দেয়া হয়।

এসিড, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এ অভিযুক্তদের বিশেষ ট্রাইবুনালে দ্রুত বিচার ও সাধারণতঃ জামিনের সুযোগ রহিত করা হয়েছে। আইন এসিডের সহজ প্রাপ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং মহিলাদের উপর এসিড সন্ত্রাস কমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আইনের দুর্বল ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে এর কার্যকারিতা বেশি হয় না। বিশেষ ট্রাইবুনাল পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার এসিড ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে ২০০২ সাল থেকে ৩৬ জন এসিড সন্ত্রাসীকে ট্রাইবুনাল সাজা দেয়।

**শিশু ঃ**

সাধারণতঃ সরকারই শিশুদের অধিকার ও কল্যাণের জন্য দায়ী। স্থানীয় ও বিদেশি এনজিও'র সমন্বিত প্রয়াসে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নতি ঘটলেও অর্ধেকেরও কিছু বেশি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে।

আইনানুযায়ী প্রত্যেক ছয় থেকে ১০ বছরের শিশুকে অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সকলকেই স্কুলে পাঠানো যায় না, কেননা পারিবারিক কাজের অজুহাতে অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবারগুলোতে ভর্তুকি দেয়ার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালের ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের হিসেব মতে ৮০ শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে, এতে পুরুষ মহিলা অনুপাত সমান রেখেছে। ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে 'ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন,

জানায়, ৭০ শতাংশ  শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল শেষ করেছে এবং এজন্য স্কুল ত্যাগের হার ২৪.৩ শতাংশতে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিসংখ্যানে এ বছর ৯৭ শতাংশ স্কুলগামী শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে সরকার দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত ভর্তুকি বাড়িয়ে মহিলাদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছে এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করেছে। বালকরা কেবল ষষ্ঠ পর্যন্ত অবৈতনিক লেখাপড়ার সুযোগ পায়। অল্পসংখ্যক সরকারি হাসপাতাল কেবল শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হয়, আইনগতভাবে মেয়েরা ১৮ বছর বয়সে এবং পুরুষ ২১ বছর বয়স বিয়ে করতে পারবে, সে ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ সমস্যা সৃষ্টি করছে। অল্প বয়সে বিয়ের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়ার খুবই দুরূহ, কেননা বিয়ে ও জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করা কঠিন।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা মাস লাইন মিডিয়া ২০০৪ সালের এক জরিপে জানায় যে, ৪০ শতাংশ বিবাহকে বাল্য বিবাহ হিসেবে গণ্য করা যায়।

বাল্য বিবাহ রোধকল্পে সরকার মেয়েদের জন্য বৃত্তির অফার দেয় যদি তাদের পরিবার বিয়ে আঠার বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ৯৩ জন শিশু অপহৃত হয়, ৩৬৬ জন নিহত হয়, ১৩৯ জন সংঘর্ষে আহত হয়, ২৭৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়, ২০ জন এসিডের শিকার হয় এবং বাকী ১৩৫ জন হারানো যায়। শিশু অধিকার কর্মীদের তথ্য মতে, শিশু অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে শিশুদের উপর নিপীড়ন কমে আসে।

হিউম্যান রাইটস মনিটরের মতে, শিশু পরিত্যাগ, অপহরণ ও শিশু পাচার একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করে। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিশু পাচার একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবেই থেকে যায় (দেখুন ধারা -৫, পাচার)।

শিশু শ্রম একটি সমস্যা, এটা শিশুদের উপর নিপীড়নের ফলশ্রুতি। কাজের ক্ষেত্রে শিশুদের উপর মালিক কর্তৃক দূর্ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরে পাচার করে যৌন নিপীড়নের মত দুবির্ষহ আচরণ সহ্য করা গেছে  (দেখুন ধারা ৬.গ এবং ৬ঘ)। বাংলাদেশ লেবার স্টাডিজের মতে, সারা বছরে শিশুদের উপর নিপীড়নের কারণে ৫০ শতাংশের উপর মৃত্যু, আহত এবং যৌন নিপীড়ন ঘটেছে।

২০০২ সালে সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস বা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে উল্লেখ করে বাংলাদেশে ৪০০,০০০ গৃহহীন শিশু রয়েছে, তাদের মধ্যে ১,৫০,০০০ শিশু তাদের পিতার পরিচয় জানে না। যাদের পিতৃপরিচয় নেই তাদের জন্য সীমিত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান।

**মানব পাচারঃ**

আইনগতভাবে আদম পাচার নিষিদ্ধ; কিন্তু তারপরও এটি সমস্যা হিসেবেই থেকে যায়, এর ছোবল পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের উপর পড়ে। অসদুদ্দেশ্যে অথবা অবৈধ উদ্দেশ্যে আদম পাচারের শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং সরকার পাচারকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। এক বছরে ৮৭টি আদম পাচারের ঘটনার বিশেষ আদালত বিচার করেছে। আদালত ৪২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে

এবং মৃত্যুদন্ড থেকে ১০ বছর কারাদন্ড প্রদান করে। পুলিশ, উপকূল রক্ষা বাহিনী, বিডিআর, র‍্যাব ও বহু এনজিও অনেককে পাচারকারির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

মহিলা এবং শিশু ব্যাপকভাবে পাচার হয়েছে প্রাথমিকভাবে ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত এবং বিভিন্ন গন্তব্যে। তাদেরকে যৌন নিপীড়নমূলক এবং শ্রমদাসে পরিণত করে। আদম পাচার হয়েছে জর্ডানের পোষাক শিল্পে এবং আরব আমীরাতের নির্মাণ শিল্পে শ্রমদাস হিসেবে। সরকারি হিসাব মতে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫৬ জনকে আদম পাচারের খপ্পড় থেকে উদ্ধার করে। আগস্ট ২০০৫ থেকে সরকার, এনজিও এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের যৌথ উদ্যোগে ১৬৮ জন শিশুকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় যারা উটের জকি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তাদের ১৬৭ জন যার যার পরিবারের সাথে মিলিত হয়। এরকম উদ্ধারকৃতদের অনেকে সরকারি বা এনজিও দ্বারা পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রে থেকে নানা রকম কারিগরি প্রশিক্ষণ নেয় এবং সেই সময়টাকে এনজিওগুলো তাদের পরিবারের সন্ধান করতে থাকে। BNWLA ৪৩ জনকে এ বছর উদ্ধার করে। এদের মধ্যে একজন নাইজেরিয় বালক এছাড়া আরব আমীরাত ও ভারত থেকে ২৭ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। যারা পাচারের দায়ে ধৃত হয়েছিল তাদের পাচারকারী হিসেবে সনাক্ত করা কঠিন বলে তারা উপযুক্ত কাগজপত্র না নিয়ে সীমানা অতিক্রমের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে থাকে।

সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চাইল্ড সার্ভিসের মধ্যে অধিকাংশ পাচারকৃত শিশুর বয়স ১০ বছরের নীচে, এবং পাচারকৃত বালিকাদের বয়স ১১ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।

পাচার হয়ে যাওয়া মহিলা ও শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা যায়নি। অধিকাংশ পাচারকারীকে ভাল চাকরী অথবা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে জোর করে অতিরিক্ত কাজে নিযুক্ত করা হয়। সেটা দেশে এবং দেশের বাইরে হচ্ছে। পিতামাতারা দারিদ্রের কারণে সন্তানদের স্বেচ্ছায় পাচার হতে দিচ্ছে। যারা আদম পাচার করে তারা গ্রামে আসে বিয়ে করার জন্য এবং পরে তাকে সুনির্দিষ্ট দেশে যেয়ে রেখে আসে। সেখানে মহিলাদের শ্রম দাসী হিসেবে শ্রম বিক্রি করতে হয়, নইলে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। দুস্কৃতিকারী চক্র এই পাচারের সাথে জড়িত থাকে। ভারতের সীমানা খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বিশেষতঃ যশোর ও বেনাপোল দিয়ে অবৈধভাবে পারাপার সহজেই সম্ভব হয়। বিপুল সংখ্যক শিশুকে পতিতালয়ে বাণিজ্যিক যৌন নিবর্তনমূলক কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এই অল্প বয়সীদের সচরাচার বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না। ইউনিসেফ ২০০৪ সালে যে হিসেব দেয়, তাতে ১০,০০০ শিশুকে দেশে বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়নে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অন্য একটি সূত্র এই সংখ্যা ২৯,০০০ সংখ্যা বলে দাবী করে (দেখুন ধারা -৫, শিশু)।

সরকারের দুর্নীতির কারণে পাচারকারীরা ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশ এবং সরকারী কর্মকর্তারা প্রায়শঃ পাচার হওয়া মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যৌন নিপীড়নের বিষয়টি উপেক্ষা করে কেননা তারা পতিতালয়ের মালিকদের থেকে প্রতিনিয়ত ঘুষ গ্রহণ করে (দেখুন ধারা ১. গ ও ৫) যদিও তহবিল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে তদন্ত বাধাগ্রস্থ হয় তবুও সরকার পাচার বিরোধী পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি জেলাতে পাচারকারীর খপ্পড়ে পড়া নারী ও শিশুদের কাছ থেকে পাচারকারীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছিল। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ

প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার দক্ষ আইনজীবীর সমন্বয়ে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় জাতীয় পুলিশ একাডেমিতে পাচার এর উপর বিশেষ কোর্স পরিচালনা করেছে। পুলিশের কেন্দ্রীয় অফিসে সরকার পাচার রোধকল্পে পাচার নিরীক্ষা সেল গঠন করে সারা বছর পাচারের উপর নজরদারী চালিয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে প্রতিমাসে সচিবের নেতৃত্ব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই সেল পুলিশের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রাসঙ্গিক মামলা নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করে। ৬৪ জেলার অতিরিক্ত উপকমিশনারের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করে সরকার তদারকি করে। এই কমিটিগুলো প্রতিমাসে কতজন আটক, শাস্তি প্রাপ্ত, মুক্তি পেয়েছে অথবা কতজন পাচার হওয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে-এর উপর প্রতিবেদন ঢাকায় প্রেরণ করে।

আটক, দন্ড এবং বিচার উত্তোরত্তর বাড়তে থাকে। ঐ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২২১ জনকে আদম পাচারের দায়ে আটক করে এবং ৩২ জনকে অভিযুক্ত করে। তাদের মধ্যে ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়। অন্যদিকে সরকার এই ইস্যুটিকে সীমিত পর্যায়ে রেখে দেয়। সরকার সর্তককরণ, গবেষণা লবিং এবং উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রতিমাসে এই ইস্যুতে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আদম পাচার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সরকার দুইটি বিশেষ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও সহযোগিতায় উটের জকিদের প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন এবং সামাজিকভাবে আত্তীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া সরকার স্থানীয় মহিলা কর্মকর্তাদের সহায়তায় একটি কমিটি গঠন করে, যারা তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সহযোগিতা করে। সরকার পাচারকারীর শিকারদের সহযোগিতা দিলেও সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ছিল অপর্যাপ্ত ও দুর্বলভাবে পরিচালিত। সরকার তাদেরকে বেসরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠাতে উৎসাহিত করে।

বহু এনজিও কম্যুনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারী নেতারা প্রতিকারমূলক, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ নথি তৈরিকরণ, পরামর্শ, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী, নেটওয়ার্ক তৈরি, আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা, আইনের প্রয়োগ, উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং আইনী সংশোধনের ব্যাপারে কাজ করে। গ্রাম পর্যায়ে জন্ম বিবাহ সনদপত্র না থাকলেও পাচার  মামলাগুলো পরিচালিত হয়। আশ্রয় কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম বৃদ্ধি করে সীমিত সাফল্য লাভ করা গেছে।

**প্রতিবন্ধী লোকজনঃ**

আইন প্রতিবন্ধী লোকদের সাথে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধী হলেও বাস্তবে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার নির্মূল, চিকিৎসা শিক্ষা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান, যানবাহনে চলাচলের সুযোগ ও পরামর্শ প্রদানের ব্যাপারে আইন জোর দেয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং 'ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব দি ডিজএবলড্' হলো সরকারী সংস্থা যারা প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করে।

সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৪ সালে সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে। পরিকল্পনাটি মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল মানসিক প্রতিবন্ধীদের সুচিকিৎসা করার ব্যাপারে সরকার সুযোগ সীমিত। কিছু কিছু বেসরকারি উদ্দ্যোগ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বিদ্যমান।

**উপজাতীয় জনগণঃ**

উপজাতীয় লোকগুলোর নিজেদের জমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমিত সুযোগ রয়েছে। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দ্বারা ২৫ বছরের গেরিলা যুদ্ধ অবসান হলেও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। ল্যান্ড কমিশন পার্বত্য জনগণ ও বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ নিরসনে কাজ করলেও তার ফলাফল সন্তোষজনক নয়। পার্বত্য জনগণ যারা যুদ্ধের সময় জমি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের প্রতি অপর্যাপ্ত সহযোগিতায় তারা অসন্তুষ্ট। এ বছর মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য মতে, ২৯ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে ও ৩৬১ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘর্ষে আহত হয়। এছাড়া ২২ জনকে অপহরণ করা হয়, ৩ জন মহিলা ধর্ষণের শিকার এবং ৪২ জন ধৃত হয়।

এপ্রিলের ৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার সাপ্রুই কারবারিপাড়া এবং পাশের দুইটি গ্রামে স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাথে উপজাতীয়দের সংঘর্ষ হয় এবং এ ঘটনায় ১২ জন আহত হয়। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় উপজাতীয়দের জমিতে বাঙ্গালী মহিলাদের বাড়ি তৈরির চেষ্টাকে কেন্দ্র করে।

জুন-১২, নিরাপত্তা বাহিন-১০ জনকে হত্যা করে, তাদের ভারতীয় বিদ্রোহী গ্রুপ এর সদস্য বলা হয়। তারা রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য এলাকায় অতি গোপনে ভারতীয় সীমানায় অবস্থান করছিল। সামরিক যৌথ বাহিনী এবং র‍্যাব সদস্যগণ বন্দুকযুদ্ধের পর তাদের ক্যাম্প হতে গোলাবারুদ উদ্ধার করে।

২০০৪ সাল হইতে রাঙ্গামাটিতে বাঙালীদের সহিত কতগুলি নির্যাতিত হয়েছে। তার সঠিক কোন সংখ্যা নাই।

আদীবাসীগণ বলে যে অন্যান্য এলাকায় বাঙালী মুসলমানদের কাছে অনেক জমিজমা তাদের হারাতে হয়। সরকার ঐ সকল সম্প্রদায় হতে যে সকল জমি অধিগ্রহণ করে তার মধ্যে মৌলভীবাজার এবং মধুপুর বন এলাকায়, প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইকো পার্ক এবং ন্যাশনাল পার্ক প্রকল্প গড়ে তোলে। আগস্ট ২১ তারিখে বন রক্ষাবাহিনীগণ সিসিলিয়া ব্বাল নামে একজন গারো মহিলাকে মধুপুর বনে জ্বালানী কাঠ কুড়াবার সময় গুলি করে আহত করে। বিএসইএইচ আর পুলিশ ফরেস্ট গার্ডদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে অসম্মতি জানায়।

**অন্যান্য সামাজিক অত্যাচার এবং বৈষম্যঃ**

সহকামিতা বেআইনী কাজ, বস্তুত এই ক্ষেত্রে আইনকে কদাচিত প্রয়োগ করা হয়। আইনের বর্ণনায় বলা হয় যে, যারা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যে কোন মানুষ, স্ত্রীলোক বা পশুর সহিত যৌন সংগম করবে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা যে কোন দন্ড মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং অর্থদন্ডও করা হবে।

সমকামী মানুষের জন্য কিছু অনিয়মিত সমর্থন ছিল। কিন্তু তা সংঘবদ্ধভাবে কিছু পরিলক্ষিত হয় না।

সমকামীদের উপর আক্রমণের ঘটনাগুলি চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর কারণ তারা অতি গোপনে এই সকল ঘটনাগুলি ঘটায় এবং স্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপ ঐ এলাকাকে মনিটর করে না, কিন্তু তারা ঘটনার কথা শুনো থাকে। এই সকল এলাকায় সরকারীভাবেও কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না, দেশে সমকামিতার উপর তেমন পড়ালেখা বা জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও তেমন নাই এবং তথ্য সংগ্রহ করণও খুবই কষ্ট সাধ্য। ২০০২ সালের হিউম্যান রাইট ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এর প্রতিবেদন মতে, সমকামি মানুষ সামাজিক বৈষম্যের কারণে পুলিশ এবং স্থানীয় অপরাধীদের দ্বারা অপমানিত এবং ধর্ষণের স্বীকার হয়। এইচআরডাব্লিউ আরো পর্যবেক্ষণ করে যে সমকামী মানুষ কখনও কখনও চাঁদাবাজীর স্বীকারও হয়। এইচআরডাব্লিউ-তে সমাজে গণ্যমান্য অফিসিয়াল এবং সামাজিক বৈষম্য থাকার কারণে এইচআইভি সেবা প্রদানেও নানা বৈষম্য দেখা যায় এবং যার ফলে এইচআই ভি/এইডস বিস্তার লাভ করে। (ধারা -৬ শ্রমিকের অধিকার)

**(ক) সমিতির অধিকার**

আইন সমিতিতে যোগদানের অধিকার প্রদান করে এবং সরকার কমিটি গঠনের অনুমতি দেয়। যাহোক, সরকার সর্বদা এই অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে না। শ্রম শক্তির সংখ্যা আনুমানিক ৬৫ মিলিয়ন যাদের মধ্যে ১.৮ মিলিয়ন, ইউনিয়নের লোক, যারা বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের লোক। বড় সেক্টরে কোন নিয়মিত শ্রমিক পরিসংখ্যান নাই, যাতে বিরাট নাগরিক শক্তি কাজ করে (৭৫% হতে ৮০%)। বিশেষ করে দেশের রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) আইনের মাধ্যমে ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ১লা নভেম্বর আইনের মাধ্যমে ইউনিয়নকে অনুমতি দেয়া হয়েছে "শ্রমিক সংগঠন" করার। কিন্তু তাদের দেন-দরবারের অধিকার থাকবে সীমিত। এটা আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত হবে। ইপিজেড কর্তৃপক্ষ এক কোম্পানী ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে অন্য কোম্পানীর প্রতিনিধিদের যোগাযোগ বা সভা করার অনুমতি দেয় না।

আটটি ভিন্ন ভিন্ন আইনকে একত্রিত করে একটি নতুন সম্মিলিত শ্রম আইন করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী, ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি কর্মস্থলে ৩০% ইউনিয়নের অংশগ্রহণ থাকতে হবে কিন্তু একই সঙ্গে তিনটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। শ্রম কর্মীগণ জোর দিয়ে বলেন যে এটা শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করবে এবং এক ইউনিয়ন হতে অন্য ইউনিয়নে স্থানান্তরিত হতে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। অনেক ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে ইউনিয়নকে অধিক কার্যক্ষেত্রে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এডভোকেসি করতে হয় এবং আইনগতভাবে বাৎসরিক কার্যক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার সহিত শ্রমিকের সম্পর্কের নিরাপত্তা বিধান করা হয় না। শ্রমিক কর্মচারীগণ এটার প্রতিবাদ করে এবং বলে যে এতে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে। বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে ছোট ছোট উদ্দ্যোগতাদের ক্ষেত্রে ।

এই বছর ILO সরকারকে সুপারিশ করে সেই সব ধারাগুলো পরিবর্তন করার জন্য যা শ্রমিক ইউনিয়ন (যেসব শ্রমিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন মালিক দ্বারা পরিচালিত) রেজিস্ট্রেশনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ৫৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে আনুমানিক ১৫% রেজিস্টার্ড ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত। এছাড়াও বেশ কিছু আন রেজিস্টার্ড ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন আছে।

ইউনিয়নগুলো সাধারণত রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা অধিক শক্তিশালী, যেমন সরকার নিয়ন্ত্রিত চট্টগ্রাম বন্দর। সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকুরীরত কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা নিষিদ্ধকরণ তাদের অতিমাত্রার রাজনীতি মানস্কতা/রাজনৈতিক চরিত্র। সরকারি ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরে) শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নে গঠন করার অনুমতি দেয়া হয় না। নুতন শ্রম আইন অনুযায়ী সিভিল এভিয়েশন এবং সমুদ্রগামী জাহাজের শ্রমিকদের কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আদালতের মাধ্যমে ইউনিয়ন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে এই ধরনের কোন কার্যক্রম বা এ্যাকশন নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। যা হোক রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখান এর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গানকারীদের আপীল করার ক্ষমতা আছে।

শিল্প বিষয়ক অধ্যাদেশ নিবন্ধিত ইউনিয়নের প্রতিরোধের বিধান আছে বা জনগণের দায় হতে ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ মুক্ত থাকে। এই সকল বিধানসমূহ সাধারণত কার্যকর করা হয় না। অতীতে বেআইনী কাজে করণে যেমন যোগাযোগ বাধা সৃষ্টি করার কারণে পুলিশ কর্মকর্তা যিনি বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে নিয়মিত ফৌজদারী আইনের অনেক ইউনিয়ন মেম্বারদের গ্রেফতার করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীগণকে আইএলও (I.L.O) মিটিং এ যোগদানের জন্য সরকারের কাছে থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

এই বছর আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (International Trade Union Confederation) শিল্প সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ এর অধীনে ইন্টারন্যশনাল ট্রেড ইউনিয়নের বাতিলকৃত অধিকারের খসড়া তৈরি করছে। এ সকল বাতিলের মধ্যে আছে ইউনিয়ন সদস্য হওয়ার বাধা বিপত্তি এবং ইউনিয়ন অফিশিয়ালদের নির্বাচন। সরকারি কর্মচারী সমিতির কার্যক্রমে বাধা বিপত্তি এবং ই.পি. রোড এর শ্রমিকদের মৌলিক শ্রম অধিকারে বিধি নিষেধ।

খ) **সম্মিলিত ভাবে সংগঠন তৈরি করা এবং চুক্তি করার অধিকার:** আইন নিয়োগ কর্তাদের হস্তক্ষেপ হতে ইউনিয়নের কার্যক্রম সংগঠন এবং পরিচালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন কোন নিরাপত্তা প্রদান করে না। বাস্তবে প্রাইভেট সেক্টরের নিয়োগ কর্তাগণ সাধারণত ইউনিয়ন কার্যক্রমে নিরুৎসাহিত করে। অগ্নিশ্রমিকগণ তাদের সংগঠন বা ইউনিয়নের প্রতি আন্তরিক হয়ে থাকে। কর্মস্থলে সংবাদদাতা নিয়োগ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে সাদা পোষাকে কাজ করা আইটিইউসি (ITUC) এবং ট্রেড ইউনিয়নকারীগণ প্রয়োজনীয়তার কিছু উদাহরণ দিয়েছে। তাদের মতে শ্রমিক শক্তির ৩০% আইনের বিধিনিষেধ মোতাবেক ইউনিয়ন সংগঠনে সম্মত। আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ করে হরতালের অধিকার স্বীকৃত করা হয়নি কিন্তু হরতাল শ্রমিকদের প্রতিবাদের সার্বজননীন অধিকার এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এর বিধান মতে একটি আইনগত অধিকার বলে স্বীকৃত।

ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রার বিধি মতে ট্রেড ইউনিয়নের বৈষম্যের অভিযোগগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আদালত শ্রমিককে পুনঃবহালের আদেশ দিয়েছে। যাহোক, শ্রম কোর্ট এর সামগ্রিক

কার্যক্রম অনেক সময় ব্যাহত হয়ে থাকে। প্রচলিত নিয়ম কানুন বদলানোর জন্য অনেক বিকল্প এবং কৌশলগত অনেক অধ্যাদেশ তৈরি করা হয়েছে।

সিবিএ কে এই শর্তে বৈধতা দেয়া হয় যে, তা ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্টার্ড হবে এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আইন সহজভাবে ব্যাখা করে কিভাবে সিবিএ নির্বাচন করতে হবে এবং তার সময়সীমা বেঁধে দেয়। সিবিএ-এর উপস্থিতি সাধারণত ঔষধ, পাট, পোষাক শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু চাকুরির নিরাপত্তার কারণে অনেক শ্রমিক সিবিএ এর কার্যক্রমে অংশ করে না। ছোট উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিবিএ-র উপস্থিতি তেমন দেখা যায় না।

এছাড়াও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বান করে। পেশাজীবী সংগঠন এবং আনরেজিস্টার্ড ইউনিয়নগুলো বছরের অনেক সময় হরতাল আহ্বান করে থাকে।

প্রয়োজনীয় সেবা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ সরকারকে অনুমোদন দিয়েছে শ্রমিকদের কর্ম বিরতি কার্যক্রম ৩ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করতে। সেই সব সেক্টরে যা অপরিহার্য বলে ঘোষণাপ্রাপ্ত। চলতি বৎসরে সরকার এই বিধি আরোপ করেছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের উপর।

সরকার এই বিধি নিষেধ আরোপ অব্যাহত রেখেছে পাটকলগুলোতে উৎপাদনের সময়। অতীতে এই নিয়ম অব্যাহত ছিল প্লেনের পাইলট, ওয়াসার কর্মী এবং জাহাজের কর্মীদের উপর। সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে কোন হরতাল বা অবরোধের আগে বা পরে তা নিষিদ্ধ করতে। আপসরফার কৌশল, সালিস এবং শ্রম আদালত সম্পর্কিত বিরোধ ইত্যাদি শ্রম সম্পর্কিতে অধ্যাদেশের আওতাধীন এবং নতুন শ্রম আইনে সংযুক্তিকৃত। এই সংযুক্তির উদ্দেশ্যে ছিল দ্রুত সময়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা। কোন দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে আপোষ মিমাংসা না হলে শ্রমিকদের কর্ম বিরতির অধিকার রয়েছে। যদি এই কর্ম বিরতি ৩০ দিনের বেশি হয় তবে সরকার তা নিষিদ্ধ করতে পারে এবং নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমন কিছু ঘটেনি।

দেশের ইপিজেডগুলোতে সরকার সীমিত আকারে ইপিজেড শ্রমিক সংগঠন এবং শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ (ইপিজেড আইন) অনুমোদন করেছে। দেশের ৮টি ইপিজেডকে শ্রমিক নিয়োগ আইন, শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ, কারখানা আইন ইত্যাদির বাইরে রেখেছে যা শ্রমিকদের সংগঠিত হতে, তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ে এবং তাদের ন্যায্য মজুরী, পাওনা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার হওয়া প্রতিহত করেছে। ইপিজেড কর্তা ব্যক্তিরা খুব ছোট আকারে এই সব বিষয় ইপিজেড অধ্যাদেশে প্রতিস্থাপন করেছেন। ইপিজেড কর্তৃপক্ষ Worker Represenation and Welfare Committee (WRWC) সদস্যদের অন্য WRWC সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়নি, এমনকি তাদের ছুটির সময়গুলোতেও। অনেক কারখানা মালিক WRWC সদস্যদের চাকুরীচ্যুত করেছেন বেপজা নির্বাহী চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতিরেকে যা আইন বহির্ভূত। ১লা নভেম্বর প্রয়োগকৃত ইপিজেড আইন অনুযায়ী শ্রমিকেরা সংগঠন করতে পারবে, যার আইনী বৈধতা থাকবে হরতাল করার, দাবী আদায়ের জন্য সিবিএ নিয়োগের এবং অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের

সাথে যোগাযোগের। বছরের শেষে ইপিজেড কর্তা ব্যক্তিরা ইপিজেড এলাকায় কোন শ্রম আদালত স্থাপন করেনি এবং শ্রমিকদের অভিযোগ দেয়া বা আইনী সহযোগিতা নেবার কোন উপায় নেই।

মে এবং জুন মাসে ঢাকা ইপিজেডে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। তখন ইপিজেড কর্তা ব্যক্তিরা শ্রমিকদের নানা রকম ভয়-ভীতি দেখায়, ইচ্ছামত তাদের আটকে রাখে, শ্রমিক এবং WRWC সদস্যদের যথেচ্ছ চাকুরীচ্যুত করে বেপজার নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদন ছাড়াই। যা পুরোপুরি আইন বহির্ভূত।

গ. **জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের নিষিদ্ধকরণ :** এই আইন শিশুসহ বাধ্যতামূলক শ্রমকে নিষিদ্ধ করে, যদিও সরকার কার্যকরভাবে এই আইনের ব্যবহার করেনি। কারখানা, দোকান এবং স্থাপনা সম্পর্কিত অধ্যাদেশে পরিদর্শনের ব্যাপারটি রাখা হয়েছে শিশু বা জোরপূর্বক শ্রমের ব্যবহারকে অনুৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু এর প্রয়োগ ছিল অপ্রতুল। বড় সংস্থাগুলোতে জোরপূর্বক শ্রমের ব্যবহার দেখা যায়নি, কিন্তু বাসা বাড়িতে শিশুসহ জোরপূর্বক শ্রমের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়, যা অনেক সময় শারীরিক অত্যাচার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। কাজের লোকের উপর শারীরিক নির্যাতনের অসংখ্য রিপোর্ট পাওয়া যায়। সেসব গৃহকর্তা বা কর্ত্রী কাজের লোকদের শারীরিক নির্যাতন করে সরকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। অনেক গরীব পরিবার টাকা-পয়সার বিনিময়ে নির্যাতনের ব্যাপারটি আপোষ করে ফেলে। নারী ও শিশু পাচার এ বছরও একটি সমস্যা ছিল।

ঘ. **শিশু শ্রম নিষিদ্ধ এবং চাকুরীর সর্বনিব বয়স :** কাজের প্রকারভেদে এবং শিশুর বয়স অনুযায়ী প্রচুর আইন রয়েছে। চরম দারিদ্রতার কারণে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সে কাজ করতে শুরু করে। ২০০৩ সালে সরকারের জাতীয় শিশু শ্রম ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন শিশু ২০০ রকমের ভিন্ন ভিন্ন কাজে লিপ্ত। "শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ" বিষয়ক একটি সমীক্ষায় ILO প্রকাশ করে যে ৪৫টি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে ২২ লাখ কর্মচারীর মধ্যে ৫,৩২,০০০ শিশু শ্রমিক কাজ করে যাদের বয়স পাঁচ থেকে ১৭-র মধ্যে। এই জরীপ চলাকালীন সময়ে কোন শিশুকে জাহাজ ভাঙা শিল্প, তামাক কারখানা, কীটনাশক তৈরি কারখানা এবং আতশবাজী কারখানায় কাজ করতে দেখা যায়নি। যে সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় শিশুদের কর্মরত পাওয়া গেছে সেগুলো হলো : করাত কল (Saw mill), ব্যাটারী রিচার্জ কারখানা, ঢালাই কারখানা, ইস্পাত কারখানা এবং ছুতোর কারখানায় (carpentry)। এই রিপোর্টে আরো বলা হয় কর্মরত অবস্থায় শিশুরা প্রায়ই শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখিন হয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই রিপোর্টটিতে বলা হয় শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বছরের অভাবের পাঁচটি মাস হাজার হাজার গরীব শিশুরা কাজ করে এবং বড়দের দ্বারা নিগৃহিত হয়। সরকার এই নিয়োগ বন্ধে ও ঐই শিশুদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ নেয় এবং অত্যাচারী নিয়োগকারীদের শাস্তি দেয়।

প্রচুর শিশু বাসা-বাড়িতে কাজ করে। সরকার মাঝে মাঝে অত্যাচারী গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়। আইন অনুযায়ী দশ বছর বয়স পর্যন্ত অথবা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুর স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এটাকে সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ করার কোন কৌশল সরকার গ্রহণ করেনি। জাতীয় শ্রম কমিটি অভিযোগ করে যে, হারভেস্ট রিচ এন্টারপ্রাইজ নামক একটি প্রতিষ্ঠান তার গার্মেন্টস্ কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এ অভিযোগ অস্বীকার করে। রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস্ শিল্প ছাড়া

অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশু শ্রম আইন যথাযথভাবে পালন করা হয় নাই। শিশু শ্রমের জরিমানাও ছিল অতি নগন্য চার থেকে দশ ডলার (২২৮ থেকে ৫৭০ টাকা)। বেশিরভাগ শিশু শ্রম নিয়োজিত ছিল কৃষি সহ বিভিন্ন প্রকার ছোট খাট শিল্পে যেখানে সরকারের কোন দৃষ্টি ছিল না। নতুন শ্রম আইন তৈরির আগে চাকুরির বৈধ বয়স বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন রকম ছিল যা ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে উঠানামা করত। নতুন আইন অনুযায়ী ১৫ বছরের নীচে যে কোন ধরনের চাকুরী নিষিদ্ধ।

ঙ. **কাজের গ্রহণযোগ্য শর্ত :** জাতীয় কোন সর্বনিব মজুরি নির্দিষ্ট করা নাই। জাতীয় মঞ্জুরী বোর্ড মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিল্পের বেতন ভাতাদি শ্রমিকদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে ঠিক করে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরে এই বেতন কাঠামো উপেক্ষা করা হয়। গার্মেন্টস্ শিল্পের ক্ষেত্রে ছোট ছোট কারখানাগুলোতে ওভারটাইম করানো, দেরিতে বেতন দেয়া ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ইপিজেড এলাকার বেতন বাইরের তুলনায় বেশি। এ বছর ITUC এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইপিজেডের বাইরে যে বেতন দেয়া হয় তা দিয়ে একটি পরিবার চালানো কঠিন। জাতীয় মঞ্জুরী কমিশন বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নে মালিকপক্ষ চরম বিরোধিতা করে অন্যদিকে আবার শ্রমিক পক্ষ এ বিরোধিতা করে কারণ নতুন বেতন কাঠামো তাদের মতে যথেষ্ট নয়।

সেপ্টেম্বর ২০০৫ এর আইন যা ঘোষণা দেয় সপ্তাহে পাঁচদিন কর্মদিবস এবং ৪০ ঘন্টা কাজের সময়সূচি তা এক পাক্ষিকভাবে প্রয়োগ হয়। এটা প্রয়োগ হয় গার্মেন্টস্, ব্যাংক, এনজিও এবং অন্যান্য অফিস কর্মচারীদের জন্য। কারখানার শ্রমিকেরা রয়ে যায় সেই পুরোনো আইনের আওতায়-সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা কাজ, একদিন ছুটি এবং ১২ ঘন্টা ওভারটাইম।

এ বছরটিতে আগুনে পুড়ে মারা যায় শতাধিক শ্রমিক এবং আহত হয় আরো অনেকে। কারখানা আইনে নামমাত্র স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলা থাকে। স্থানীয় এনজিওগুলোর মতে, কারখানার মালিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর যে উদ্যোগ তা মোটেই আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ নয়। আইনটি ব্যাপক কিন্তু তা পুরোপুরি উপেক্ষিত মালিকপক্ষের দ্বারা। শ্রমিকেরা আইনের সহায়তা চাইতে পারে, কিন্তু তেমনটি খুব কমই ঘটে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দ্বারা আইনটির প্রয়োগের দিকটিও খুব দুর্বল। কারণ প্রথমত কম সংখ্যক শ্রম পরিদর্শক এবং দ্বিতীয়ত তাদের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা। উচ্চ বেকারত্বের হার এবং আইন প্রয়োগে অপ্রতুলতার কারণে যেসব শ্রমিক বিপদজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা তাদের চাকুরি হারানোর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।